Fotic Chand by Satyajit Roy

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.MurchOna.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com

গল্প

ফটিকচাঁদ

১

ও যে কখন চোখ খুলেছে ও জানে না। চোখে কিছু দেখার আগে ও বুঝেছে ওর শীত করছে, ওর গা ভিজে, ওর পিঠের তলায় ঘাস, ওর মাথার নিচে একটা শক্ত জিনিস। আর তার পরেই বুঝেছে ওর গায়ে অনেক জায়গায় ব্যথা। তবু ডান হাতটাকে তুলে আস্তে আস্তে ভাঁজ করে মাথার পিছনে নিতেই হাতে ঠাণ্ডা পাথর ঠেকল। বড় পাথর, হাত দিয়ে সরাতে পারবে না। তার চেয়ে মাথাটা সরাই না কেন ? ও তাই করল, আর তাতে ও আর একটু চিত হয়ে গেল।

এবার ও বুঝল ও দেখতে পাচ্ছে। এতক্ষণ পায়নি তার কারণ এখন রাত, আর ও শুয়ে আছে আকাশের নিচে, আর আকাশে মেঘ ছিল। এখন মেঘ সরে যাচ্ছে আর জ্বলজ্বলে তারাগুলো বেরিয়ে আসছে।

ও বুঝতে চেষ্টা করল ওর কী হয়েছে। এখন ও উঠবে না। আগে বুঝে নেবে ওর কী হয়েছে ;—ও কেন ঘাসের উপর শুয়ে আছে, কেন ওর গায়ে ব্যথা, কেন ওর মাথাটা দপদপ করছে।

ওটা কিসের শব্দ হচ্ছে একটানা ?

একটু ভাবতেই ওর মনে পড়ল। ওটাকে বলে ঝিঁঝি পোকা। ঝিঁঝি ডাকছে। ঝিঁঝি ডাকে কি ? না, ডাকে না। ঝিঁঝি পাখি নয়, ঝিঁঝি পোকা। এটা ও জানে। কী করে জানল ? কে বলেছে ওকে ? ওর মনে নেই।

ও ঘাড়টা একটু কাত করল। মাথাটা ঝনঝন করে উঠল। তা করুক। ও বেশি না নড়ে এদিক-ওদিক দেখে নেবে। ও এখন এ-সময়ে এখানে কেন, সেটা জানতে হবে।

ওটা কী ? তারাগুলো আকাশ থেকে নেমে এল নাকি ?

না। মনে পড়েছে। ওগুলো জোনাকি। জোনাকি অন্ধকারে দপদপ করে

জ্বলে আর ঘুরে ঘুরে ওড়ে। জোনাকির আলো ঠাণ্ডা আলো। হাতে নিলে গরম লাগে না। কে বলেছে ওকে ? মনে নেই।

জোনাকি মানে ওখানে গাছ। গাছের আশেপাশেই জোনাকি ঘোরে। আর ঝোপেঝাড়ে ঘোরে জোনাকি। ওখানে অনেক জোনাকি। ওই যে কাছে, আবার একটু দূরে, আবার অনেক দূরে। তার মানে অনেক গাছ। অনেক গাছ একসঙ্গে থাকলে কী বলে ? মনে পড়ছে না।

ও এবার অন্যদিকে মাথা ঘোরাল। আবার মাথাটা টনটন করে উঠল।

ওদিকেও অনেক গাছে অনেক জোনাকি। গাছের মাথা আকাশে মিশে গেছে, দুটোই এত কালো। আকাশে তারা এক জায়গায় থেমে জ্বলজ্বল করছে, গাছে জোনাকি ঘুরে ঘুরে জ্বলজ্বল করছে।

ওদিকের গাছগুলো দূরে, কারণ মাঝখানে রাস্তা। রাস্তায় ওটা কী ? আগে দেখেনি, এখন দেখছে, ক্রমে দেখছে।

একটা গাড়ি। দাঁড়িয়ে আছে। না, দাঁড়িয়ে না ; এক পাশে কাত হয়ে আছে। গাড়ির পিছনটা এখন ওর দিকে।

ওটা কার গাড়ি ? ও ছিল কি ওটার মধ্যে ? কোথাও যাচ্ছিল কি ? ও জানে না। ওর মনে নেই।

গাড়িটাকে দেখে কেন জানি ভয় করল ওর। শুধু ও আর গাড়ি—আর কেউ নেই। কোনো মানুষ নেই ; শুধু ও নিজে মানুষ। আর গাড়িটা কাত হয়ে ওর দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে আছে।

ও জানে উঠলে ব্যথা লাগবে। তাও ও উঠল। উঠেই আবার পড়ে গেল। তারপর আবার উঠে এগিয়ে গেল গাছের দিকে, গাড়ির উলটো দিকে।

এটা জঙ্গল। একে বলে জঙ্গল। মনে পড়েছে। এখনো রাত। এখনো অন্ধকার। তাও বোঝা যায় জঙ্গল। একটু একটু দেখতে পাচ্ছে ও। তারার আলোয় তাহলে দেখা যায়। চাঁদের আলোয় আরো বেশি। সূর্যের আলোয় সব কিছু।

ও তিনটে গাছ পেরিয়ে চারের পাশে এসে থেমে গেল। ওর সামনে শুধু গাছ নয়, আরো কিছু আছে। একটু দূরে। ও গাছের গুঁড়ির পিছনে নিজেকে আড়াল করে মাথাটা বার করে ভালো করে দেখল।

একপাল জন্তু। তারা একসঙ্গে হাঁটছে, তাই খসখস শব্দ হচ্ছে। ঝিঁঝির শব্দ কমে এসেছে, তাই পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওই যে মাথায় শিং—একটার, দুটোর...আরেকটার। ওগুলোকে হরিণ বলে। ওর মনে আছে। একটা হরিণ হঠাৎ থেমে মাথা তুলে দাঁড়াল। অন্যগুলোও দাঁড়াল। কী যেন শুনছে।

এবার ও-ও শুনল। একটা গাড়ির আওয়াজ। দূর থেকে এগিয়ে আসছে

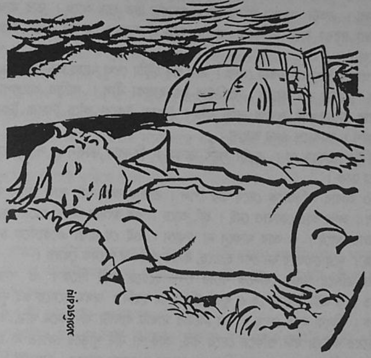

গাড়িটা।

হরিণগুলো পালাল। লাফ দিয়ে দৌড় দিয়ে পালাল। এই ছিল, এই নেই। সবগুলো একসঙ্গে।

গাড়িটা এগিয়ে আসছে। এবার ও অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছে। পিছনের আকাশ আর তেমন কালো নেই। গাছের মাথা আকাশ থেকে আলগা হয়ে গেছে। তারাগুলো ফিকে হয়ে গেছে।

ও আবার উলটো দিকে ঘুরল। এবার বোধহয় গাড়িটাকে দেখা যাবে। ও এগিয়ে গেল রাস্তার দিকে, কিন্তু জোরে হাঁটতে পারল না। ওর পায়ে বেশ ব্যথা। খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে।

গাড়িটা এসে চলে গেল। একে বলে লরি। সবুজ রঙের লরি, তাতে বোঝাই করা মাল। কাত-হওয়া গাড়িটার পাশে এসে লরিটা একটু আস্তে চলল, কিন্তু থামল না।

পা টেনে টেনে ও আবার রাস্তায় পৌঁছল। এখন আলো বেড়েছে, তাই পরিষ্কার দেখল গাড়িটাকে। গাড়ির সামনেটা দুমড়ে তুবড়ে কুঁচকে আছে।

ঢাকনাটা আধখোলা হয়ে বেঁকে ভেঙে হাঁ হয়ে আছে। সামনের দরজাটা খোলা। একটা মানুষের মাথার চুল। মানুষটা চিত হয়ে আছে। তার মাথাটা খোলা দরজা দিয়ে খানিকটা বাইরে বেরিয়ে আছে। মাথার নিচে রাস্তাটা ভিজে।

গাড়ির পিছনেও একটা লোক। তার শুধু হাঁটুটা দেখা যাচ্ছে জানালা দিয়ে। তার প্যান্টের রঙ কালো। গাড়িটার রঙ হালকা নীল। গাড়ির আশেপাশে রাস্তার অনেকখানি জায়গা জুড়ে কাঁচ। টুকরো টুকরো কাঁচে টুকরো টুকরো আকাশ। আকাশে এখন আলো।

ঝিঁঝি ডাকছে না। একটা পাখি ডাকল। তিনবার ডাকল। সরু শিসের মতো ডাক।

ও আবার গাড়িটাকে দেখে ভয় পেল। রাস্তায় কাঁচ আর লাল দেখে ভয় পেল। লাল আর কোথাও নেই। হ্যাঁ, আছে। ওর জামায় আছে, হাতে আছে, মোজায় আছে। ও আর থাকবে না এখানে। ওই যে রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে। দূরে বোধহয় বন শেষ হয়েছে, কারণ ওদিকটা অনেক খোলা।

ও এগিয়ে চলল যেদিকে বনের শেষ হয়েছে সেই দিকে। ও পারবে যেতে। ও এটা বুঝেছে যে ও খুব বেশি জখম হয়নি। জখম হয়েছে ওই দুটো লোক। কিংবা মরে গেছে। ওর নিজের মাথার ব্যথাটা যদি কমে যায়, আর কনুইয়ের কাটাটা যদি শুকিয়ে সেরে যায়, আর পা যদি খুঁড়িয়ে চলতে না হয়, তাহলে কেউ ওকে কেমন আছ জিজ্ঞেস করলে ও বলতে পারবে—ভালোই।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ওর যে কেন কিছু মনে পড়ছে না সেটা ও বুঝতেই পারছে না। আজ এই কিছুক্ষণ আগে আকাশে তারা দেখার আগের কোনো কথাই ওর মনে নেই। এমন-কি ওর নিজের নামটাও না। ও শুধু জানে ওখানে একটা ভাঙা গাড়ি, তাতে দুটো লোক পড়ে আছে আর নড়ছে না। ও জানে এটা রাস্তা, ওটা ঘাস, ওগুলো গাছ, মাথার উপর আকাশ, আকাশের একটা দিক এখন লাল, তার মানে সূর্য উঠবে, তাহলে এটা সকাল।

ও হাঁটছে। পাখির ডাকে কান পাতা যায় না। এবার গাছগুলো চেনা যাচ্ছে। ওটা বট, ওটা আম, ওটা শিমুল, ওটা—ওটা কী ? পেয়ারা না ? ওই তো পেয়ারা হয়ে আছে।

পেয়ারা চিনেই ওর খিদে পেল। ও গাছটার দিকে এগিয়ে গেল রাস্তা থেকে নেমে। ভাগ্যিস পেয়ারা, ভাগ্যিস আম না। আম গাছে আম আছে, কিন্তু ও জানে ওর গায়ে ব্যথা, ও গাছে চড়তে পারবে না। পেয়ারাটা হাতের কাছে। পর পর দুটো খেল ও।

বনের শেষে রাস্তা আরেকটা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। কোন্ দিকে যাবে

ও ? ও জানে না। শেষে না ভেবে ডাইনে ঘুরে কিছুদূর গিয়ে আর না পেরে ও একটা নাম-না-জানা গাছের নিচে বসে পড়ল। গাছের গুঁড়িতে সাদা-কালো ডোরা কাটা। শুধু এ গাছটায় নয়, রাস্তার দু'দিকে যত দূরে যত গাছ দেখা যায় সবটাতে ডোরা কাটা। কে দিয়েছে, কেন দিয়েছে সাদা-কালো রঙ তা অনেক ভেবেও বুঝতে পারল না।

আর ভাবতে চায় না ও। মাথাটা আবার দপদপ করছে। আর সেই সঙ্গে বুঝতে পারল, ওর নাকটা কুঁচকে যাচ্ছে, ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে।

এটা জোরে শ্বাস নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখটা জলে ভরে গেল। আর তার পরেই ওর চোখের সামনে থেকে গাছ রাস্তা সাদা-কালো হলদে-সবুজ সব মিশে মুছে হারিয়ে ফুরিয়ে গেল।

॥ ২ ॥

ওর সামনে একটা মানুষের মাথা নড়ছে। দাড়িওয়ালা পাগড়িওয়ালা মানুষের মাথা। না, মানুষটা নড়ছে না, আসলে ও নিজেই নড়ছে। মানুষটা ওর গা ধরে নাড়া দিচ্ছে।

'দুধ পী লো বেটা—গরম দুধ।'

লোকটার হাতে একটা কাঁচের গেলাসে দুধ থেকে একটু একটু ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

এবার ও বুঝল। একটা লরির পিছনে ও শুয়ে আছে। লরিতে মাল, মালের এক পাশে, যেদিকটা খুলে যায় লরির, সেইদিকে একটুখানি জায়গাতে ও একটা চাদরের উপর শুয়ে আছে। ওর গায়েও একটা চাদর, আর মাথার নিচে পুঁটলি-করা কিছু কাপড়।

লোকটার কাছ থেকে গেলাসটা নিয়ে ও উঠে বসল। লরির এক পাশে রাস্তা, অন্যদিকে একটা খাবারের দোকান। দোকানের সামনে কয়েকটা বেঞ্চি পাতা, তাতে তিনজন লোক বসে চা খাচ্ছে। আরো দোকান রয়েছে রাস্তার দু'ধারে। একটায় বোধহয় গাড়ি মেরামত হয় ; সেখান থেকে ঠুকঠাক আওয়াজ আসছে। দোকানটার সামনে একটা কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশে একজন শার্ট আর প্যান্ট পরা লোক রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ মুছছে।

পাগড়ি-পরা লোকটা দোকানের দিকে চলে গিয়েছিল, আবার ওর দিকে এগিয়ে এল। ওর পিছন পিছন বেঞ্চির লোকগুলোও এগিয়ে এল।

'কেয়া নাম হ্যায় তুম্‌হারা ?' পাগড়িওয়ালা লোকটা জিজ্ঞেস করল। ওর হাতে এখনো দুধের গেলাস, অর্ধেক খাওয়া হয়েছে। খুব ভালো দুধ, খুব ভালো

লাগছে খেতে।

ও বলল, 'জানি না।'

'কেয়া জানি না? তুম বাংগালী আছে?'

ও মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। নিশ্চয়ই বাঙালী। এতক্ষণ অবধি ও যা ভেবেছে সবই তো বাংলাতে।

'তোমার ঘর কুথায়? চোট লাগা ক্যায়সে? সাথে আউর আদমি ছিল? তারা কুথায় গেল?'

'জানি না, আমার মনে নেই।'

'কী ব্যাপার? ছেলেটি কে?'

সেই কালো গাড়ির লোকটা এগিয়ে এসেছে লরির দিকে। মাথায় বেশি চুল নেই, কিন্তু বয়স বেশি না। লোকটা চোখ কুঁচকে একদৃষ্টে দেখছে ওর দিকে। পাগড়িওয়ালা হিন্দিতে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। খুব সহজ। রাস্তার ধারে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে লরিতে তুলে নিয়ে আসে। পরিচয় পেয়ে যদি দেখে কলকাতার ছেলে, তাহলে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেবে।

বাঙালী ভদ্রলোক এবার আরো কাছে এলেন।

'তোমার নাম কী?'

নামটা ভুলে গিয়ে ওর খুব মুশকিল হয়েছে। ওকে আবার জানি না বলতে হল, আর পাগড়িওয়ালা হো-হো করে হেসে উঠল। '—জানি না, জানি না ছোড়কে আউর কুছ বোলতা হি নেহি।'

'জানি না মানে কী? ভুলে গেছ?'

'হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক কনুইয়ের জখমটা দেখলেন।

'আর কোথায় লেগেছে?'

ও হাঁটুর ছড়াটা দেখিয়ে দিল।

'মাথায় লেগেছে?'

'হ্যাঁ।'

'দেখি, মাথা হেঁট করো।'

ও হেঁট করলে পর ভদ্রলোক ফোলা জায়গাটা ভালো করে দেখলেন। হাত দিতে ব্যথা লাগায় ও শিউরে উঠেছিল।

'একটু কেটেওছে বোধহয়। চুলের মধ্যে রক্ত জমে আছে মনে হচ্ছে।...তুমি নামতে পারবে? দেখ তো—এস।'

ও হাতের গেলাস পাগড়িওয়ালাকে দিয়ে পা ঝুলিয়ে হাত বাড়াতেই ভদ্রলোক ওকে খুব সাবধানে ব্যথা না লাগিয়ে নামিয়ে নিলেন; তারপর পাগড়িওয়ালার

সঙ্গে ভদ্রলোক কথা বলে নিলেন। খড়গপুর আর ত্রিশ মাইল দূর। ওখানে ডিসপেনসারিতে গিয়ে ওকে ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ করিয়ে নিয়ে ভদ্রলোক ওকে সঙ্গে করে সোজা চলে যাবেন কলকাতা।

'সিধা থানা মে লে যাইয়ে', পাগড়িওয়ালা বলল। 'কুছ গড়বড় হুয়া মালুম হোতা।'

থানা যে কী জিনিস সেটা বুঝতে ওর কিছুটা সময় লাগল। তারপর পুলিশ কথাটা কানে আসতে ওর বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করে উঠল। পুলিশ চোর ধরে। শাস্তি দেয়। ও চুরি করেছে বলে তো ও জানে না!

ভদ্রলোক নিজেই গাড়ি চালান। সামনে ওকে নিজের পাশে বসিয়ে নিলেন। গাড়ি ছাড়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই দোকান ঘরবাড়ি শেষ হয়ে গিয়ে খোলা মাঠ পড়ল। ও বুঝতে পারছিল যে ভদ্রলোক মাঝে মাঝে আড়চোখে ওর দিকে দেখছেন। কিছুক্ষণ পরেই উনি আবার প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন।

'তুমি কলকাতায় থাক?'

ও তাতেও বলল, 'জানি না।'

'তোমার বাপ মা ভাই বোন কারুর কথা মনে পড়ছে না?'

'না।'

তারপর ও নিজে থেকেই রাত্তিরের ঘটনাটা বলল। ভাঙা গাড়ির কথাটা বলল। দুটো লোকের কথা বলল।

'গাড়ির নম্বরটা দেখেছিলে?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

'না।'

'লোকগুলো কী রকম দেখতে মনে আছে?'

ও যা মনে আছে বলল। বাকি রাস্তা ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে রইলেন, আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

এখন দুটো বেজেছে সেটা ও ভদ্রলোকের হাতঘড়িটা দেখে জেনে নিয়েছে। একবার ভেবেছিল ও বলবে যে ওর খিদে পেয়েছে, শুধু দুটো পেয়ারা আর এক গেলাস দুধে পেট ভরেনি; কিন্তু সেটা আর বলার দরকার হল না। যেখানে রাস্তার ধারে খড়গপুর ১২ কিলোমিটার লেখা পাথরটা রয়েছে, তার পাশেই একটা গাছের তলায় ভদ্রলোক গাড়িটা দাঁড় করিয়ে একটা সাদা কাগজের বাক্স খুলে তার থেকে লুচি আর আলুর তরকারি বার করে ওকে দিলেন, আর নিজেও নিলেন। চ্যাপটা সাদা গোল জিনিসটার নাম যে লুচি সেটা ওর কিছুতেই মনে পড়ছিল না, শেষে আকাশে অনেকগুলো পাখিকে একসঙ্গে উড়তে দেখে চিল মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লুচি মনে এসে গেল।

পাথরের ফলকের নম্বর বারো থেকে কমতে কমতে দুই হবার পরেই খড়গপুর

শহর দেখা গেল। ভদ্রলোক বললেন, 'খড়গপুর এসেছ কখনো ?'

ওর খড়গপুর নামটাই মনে নেই, এসেছে কিনা জানবে কী করে ? দেখে মনে হল ও কোনোদিন এখানে আসেনি। ভদ্রলোক বললেন, 'এখানে একটা বড় ইস্কুল আছে, তাকে বলে আই আই টি।'

আই আই টি কথাটা ওর মাথার মধ্যে কিছুক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে শহরের শব্দ বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেল।

একটা চৌমাথায় একটা পুলিশ দেখেই ওর বুকটা আবার কেঁপে উঠল, আর ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, 'আমার পুলিশ ভালো লাগে না।'

ভদ্রলোক রাস্তার দিকে চোখ রেখেই বললেন, 'পুলিশে খবর দিতেই হবে। ও নিয়ে তুমি কথা বোলো না। তুমি ভদ্রঘরের ছেলে তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়। তোমার বাপ-মা আছেন নিশ্চয়ই। তুমি তাঁদের ভুলে গেলেও তাঁরা নিশ্চয়ই তোমাকে ভোলেননি। তুমি কে, সেটা জানতে হলে পুলিশের কাছে যেতেই হবে, আর তারাই তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারবে। পুলিশ তো খারাপ নয়। পুলিশ অনেক ভালো কাজ করে।'

শংকর ফার্মেসির ডাক্তার ওর ছড়ে-যাওয়া জায়গাগুলোতে ওষুধ লাগিয়ে দিলেন, মাথায় বরফ লাগিয়ে দিলেন, কনুইয়ের উপর ওষুধ দিয়ে তুলো লাগিয়ে তার উপর একটা আঠাওয়ালা তাপ্পি মেরে দিলেন। এবার যিনি ওকে এনেছিলেন তিনি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের এখানে থানাটা কোথায় ?'

ডাক্তার কিছু বলার আগেই ও বলল, 'আমি একটু বাথরুম যাব।'

'এস আমার সঙ্গে', বলে ডাক্তারবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।

ডাক্তারখানার পিছন দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটা বারান্দা। সেই বারান্দার শেষ মাথায় একটা দরজা দেখিয়ে দিলেন ডাক্তারবাবু।

ও দরজা খুলে ঘরে ঢুকেই ছিটকিনিটা লাগিয়ে দিল। তারপর সত্যি করেই বাথরুমের কাজ সেরে আরেকটা বন্ধ দরজার ছিটকিনি খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

এটা একটা গলি। ডাইনে গেলেই বড় রাস্তা। তার মানে ধরা পড়ার ভয়। ও বাঁয়ে ঘুরল। কোথায় যাচ্ছে জানে না, তবে পুলিশের কাছে নয় এটা ভেবেই ফূর্তি। ওর কনুইয়ের ব্যান্ডেজ, ময়লা কাপড়, রক্তের দাগ, খুঁড়িয়ে হাঁটা—এই সবের জন্যেই বোধহয় রাস্তার কিছু লোক ওর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে। কিন্তু কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না ওকে।

ও এগিয়ে চলল। ট্রেনের ভোঁ শোনা যাচ্ছে।

গলিটা শেষ হতেই একটা বেশ বড় রাস্তা পড়ল। এ রাস্তায় অনেক লোক,

সবাই ব্যস্ত, কেউ ওর দিকে চাইছে না। বাঁদিকে লোহার রেলিং-এর ওপারে রেলের লাইন। অনেকগুলো পাশাপাশি লাইন ; তার মধ্যে একটাতে একটা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ইঞ্জিনের ভোঁ শোনা যাচ্ছে খুব জোরে আর কাছে। সামনে লাইনের পাশে একটা লোহার ডাণ্ডার মাথায় অনেকগুলো আড়াআড়ি ছোট ডাণ্ডা, তাদের গায়ে লাল-সবুজ গোল গোল আলো। কী যেন বলে ওগুলোকে ? ওর মনে পড়ল না।

ওই যে সামনে স্টেশন। বেশ বড় স্টেশন। একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তার সামনে প্ল্যাটফর্মে লোকের ভিড়।

ও খোঁড়াতে খোঁড়াতে স্টেশনের ভিতর গিয়ে ঢুকল। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনটা। ভোঁ বেজে উঠল ইঞ্জিনের দিক থেকে। ওর মনটা ছটফটিয়ে বলে উঠল—তোমাকে উঠতে হবে এই গাড়িতে। এই সুযোগ। এই বেলা উঠে পড়ো !

ওর সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে চারদিকে লোক ছুটোছুটি করছে। পিছন থেকে একটা পুঁটলির ধাক্কায় ও প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। কোনো রকমে সামলে এগিয়ে গিয়েই দেখল ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। গাড়িগুলো সরে সরে যাচ্ছে ওর সামনে দিয়ে। ও আরো এগোল। সব দরজা বন্ধ। খোলা দরজা না পেলে ও উঠবে কী করে ?

ওই একটা দরজা খোলা। ও কি পারবে উঠতে ? পারবে না। ওর হাতে জোর নেই। পায়ে জোর নেই। তবু মন বলছে এই সুযোগ, এগিয়ে যাও।

ও এগিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে দিল। ওই যে দরজা। সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হবে। তারপর হাতল ধরে লাফ। পা হড়কালেই ফসকে গিয়ে একেবারে—

ওর পা আর মাটিতে নেই। পা ফসকায়নি। একটা হাত কামরা থেকে বেরিয়ে এসে ওর কোমর জাপটে ধরে হুশ করে ওকে কামরায় তুলে নিল। আর তার পরেই শুনল ও ধমক—

'ইয়ার্কি হচ্ছে ? মারব নাকি ল্যাঙা ঠ্যাঙে ঠ্যাঙার বাড়ি ?'

॥ ৩ ॥

ও এখন বেঞ্চিতে বসে হাঁপাচ্ছে। এত জোরে নিশ্বাস নিতে হচ্ছে যে কথা বলতে চাইলেও পারবে না। ও লোকটার দিকে চেয়ে আছে। ধমক দিলে কী হবে—মুখ দেখে মনে হয় না খুব বেশি রাগ করেছে। কিংবা হয়তো প্রথমে রেগেছিল, এখন ওকে ভালো করে দেখে রাগটা কমে গেছে। এখন ওর চোখে চালাক হাসি, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁতগুলোতে রোদ পড়ে হাসি আরো খোলতাই

হয়েছে। দেখে মনে হয় লোকটার মাথায় হাজার বুদ্ধি কিলবিল করে, আর সেগুলো খাটিয়ে সারাটা জীবন সে চালিয়ে দিতে পারে।

কামরায় আরো লোক রয়েছে, কিন্তু ওদের বেঞ্চিতে কেবল ওরা দু'জন। সামনের বেঞ্চিতে তিনজন বুড়ো পাশাপাশি বসে আছে। একজন বসে বসেই ঘুমোচ্ছে, একজন এইমাত্র এক চিমটে কালো গুঁড়ো নিয়ে নাকের ফুটোর সামনে ধরে হাতটাকে ঝাঁকি দিয়ে নিশ্বাস টেনে নিল। আরেকজন খবরের কাগজ পড়ছে। ট্রেনের দুলুনি যত বাড়ছে তাকে তত বেশি শক্ত করে কাগজটাকে ধরে চোখের কাছে নিয়ে আসতে হচ্ছে।

'এবার বলো তো চাঁদ, মতলবখানা কী ?'

লোকটার গলা গম্ভীর কিন্তু হাসিটা এখনো যায়নি। সে এমনভাবে চেয়ে আছে ওর দিকে যেন চাহনির জোরেই ওর মনের সব কথা জেনে যাবে।

ও চুপ করে রইল। মতলব তো পুলিশের কাছ থেকে পালানো ; কিন্তু সেটা ও বলতে পারল না।

'পুলিশ ?'—ওর মনের কথা জেনে তাক্ করে দিয়ে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'চালের ব্যাপার ?'—লোকটা আবার জিজ্ঞেস করল। এই নিয়ে পর পর তিনটে প্রশ্ন করল যার একটারও উত্তর ও দেয়নি।

'উহু। তুমি ভদ্দরলোকের ছেলে। চালের থলি কাঁধে নিয়ে ছুটবে এমন তাগদ নেই তোমার।'

ও এখনো চুপ করে আছে। লোকটাও ওর দিকে সেই ভাবেই চেয়ে আছে।

'পেটে বোমা মারতে হবে নাকি ?'—এবার বলল লোকটা। তারপর কাছে এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বলল, 'আমাকে বলতে কী ? আমি কাউকে বলব না। আমিও ঘর-পালানো ছেলে, তোমার মতন।'

ও জানত যে এবার লোকটা ওর নাম জিজ্ঞেস করবে, তাই ও উলটে ওকেই ওর নাম জিজ্ঞেস করে ফেলল। লোকটা বলল, 'আমার নামটা পরে হবে, আগে তোমারটা শুনি।'

বার বার জানি না বলতে ওর মোটেই ভালো লাগছিল না। খড়গপুর ডাক্তারখানার উলটো দিকে একটা দোকানের দরজার উপরে ও একটুক্ষণ আগেই একটা নাম দেখেছে। সাদা টিনের বোর্ডে কালো দিয়ে লেখা—'মহামায়া স্টোরস', আর তার নিচে 'প্রোঃ ফটিকচন্দ্র পাল'। ও তাই ফস্ করে বলে দিল—'ফটিক'।

'ডাকনাম না ভালো নাম ?'

'ভালো নাম।'

'পদবী কী ?'

'পদবী ?'

পদবী কথাটার মানের জন্য ওর কিছুক্ষণ মাথার মধ্যে হাতড়াতে হল।

'পদবী বোঝ না ?'—লোকটা বলল। 'তুমি কি সাহেব ইস্কুলে পড় নাকি ? সারনেম। সারনেম বোঝ ?'

সারনেম ও আরোই বোঝে না।

'নামের শেষে যেটা থাকে', লোকটা ধমক দিয়ে বলল। 'যেমন রবির শেষে ঠাকুর।...তুমি সত্যিই বোকা, না বোকা সেজে রয়েচ সেটা আমাকে জানতে হবে।'

নামের শেষে বলাতেই ও বুঝে ফেলেছে। বলল, 'পাল। পদবী পাল। আর মাঝখানে চন্দ্র। ফটিকচন্দ্র পাল।'

লোকটা একটুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে রইল। তারপর তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'যে লোকটা ঝড়াকসে নিজের একটা নাম বানিয়ে বলতে পারে সেও আর্টিস্ট। এসো, হারুনের সঙ্গে হাত মেলাও ফটিকচাঁদ পাল। হারুন, মাঝখানে অল, শেষে রসিদ। বোগ্দাদের খলিফ, জগলরের বাদশা।'

ও হাতটা বাড়িয়ে দিল বটে, কিন্তু লোকটা ওর বানানো নাম বিশ্বাস করল না বলে ওর একটু রাগ হল।

'তুমি যে-বাড়ির ছেলে', লোকটা সটান ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেসব বাড়ি থেকে ফটিক নামটা উঠে গেছে সিরাজদ্দৌলার আমল থেকে।—দেখি তোমার হাতের তেলো।'

ও কিছু বলার আগেই লোকটা ওর ডান হাতটা খপ্ করে তেলোটা দেখে নিয়ে বলল, 'হুঁ...বাসের রড ধরে ঝুলতে হয়নি কস্মিনকালেও।...শার্টের দাম কম-সে-কম ফর্টিফাইভ চিপ্স...টেরিকটের প্যান্ট...নো মাদুলি...লাস্ট টিকেটা উঠেছিল কি ? হুঁ...সেলুনে ছাঁটা চুল, খুব বেশিদিন না...পার্কস্ট্রীটের সেলুন কি ? তাই তো মনে হচ্ছে ?...'

লোকটা আবার চেয়ে আছে ওর দিকে ; হয়তো চাইছে ও কিছু বলুক। ও বাধ্য হয়েই বলল, 'আমার কিচ্ছু মনে নেই।'

লোকটার চোখ দুটো হঠাৎ খুদে খুদে আর জ্বলজ্বলে হয়ে গেল।

'বোগ্দাদের খলিফের সঙ্গে ফচকেমো করতে এসো না চাঁদ। ওসব কারচুপি খাটবে না আমার কাছে। তুমি অনেক ভাজা মাছ উলটে খেয়েচো। সাহেবী ইস্কুলের তালিম তোমার, হুঁ-হুঁ! ব্যাড কোম্পানি হয়ে এখন বাপের খপ্পর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেচ। আমি কি আর বুঝি না ? কনুইয়ে চোট লাগল কী করে ? মাথা ফুলেচে কেন ? ল্যাংচাচ্চ কেন ? যা বলবার সাফ বলে ফেল তো

চাঁদ ! নইলে ঘাড় ধরে নামিয়ে দোব জকপুরে গাড়ি থামলেই । ...বল, বলে ফেল ।'

ও বলল । সব বলল । ওর মনে হল একে বলা যায় । এ লোকটা ক্ষতি করবে না ওর, ওকে পুলিশে দেবে না । আকাশে তারা দেখা থেকে আরম্ভ করে বাথরুমের পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সব বলল ।

লোকটা শুনে-টুনে কিছুক্ষণ চুপ করে জানালা দিয়ে বাইরের চলন্ত মাঠঘাটের দিকে চেয়ে ভাবল । তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'তোমার তো তাহলে একটা ডেরা লাগবে কলকাতায় । আমি যেখানে থাকি সেখানে তো তোমার থাকা পোষাবে না ।'

'তুমি কলকাতায় থাক ?'

'আগে থেকেচি । এখন আবার থাকব । ডেরা একটা আছে আমার এনটালিতে । মাঝে-মধ্যে এদিক-সেদিক ঘুরতে বেরোই বাক্স নিয়ে । রথের মেলা, চড়কের মেলা, শিবরাত্তিরের মেলা । বিয়েশাদিতেও বায়না জুটে যায় টাইম টু টাইম । এখন আসচি কোয়েম্বাটোর থেকে । কোয়েম্বাটোর জান ? মাদ্রাজে । তিন হপ্তা স্রেফ ইডলি-দোসা । এক সার্কাস কোম্পানির সঙ্গে কথা বলে এসেচি । ভেঙ্কটেশ ট্রাপীজ দেখায় গ্রেট ডায়মন্ডে, আমার সঙ্গে দোস্তি হয়েচে । বলেচে চান্স হলেই জানাবে । আপাতত কলকাতা । শহীদ মিনারের নিচে ঘাসের উপর একফালি জায়গা, ব্যস্ ।'

'তুমি ঘাসের উপর থাকবে ?' ও জিজ্ঞেস করল । ও নিজে অনেকক্ষণ ঘাসের উপর শুয়ে ছিল সেটা ওর মনে আছে ।

লোকটা বলল, 'থাকব না, খেল দেখাব । ওই যে বেঞ্চির নিচে বাক্সটা দেখছ, ওর মধ্যে আমার খেলার জিনিস আছে । জাগ্‌লিং-এর খেলা । একটি জিনিসও আমার নিজের কেনা নয় । সব ওস্তাদের দেওয়া ।'—ওস্তাদ কথাটা বলেই লোকটা তিনবার কপালে হাত ঠেকাল । —'তিয়াত্তর বছর বয়স অবধি খেল দেখিয়েছিল । তখনও চিরুনি দিয়ে দু' ভাগ করে আঁচড়ানো দাড়ির অর্ধেক কাঁচা । নমাজ পড়ার মতো করে বসে লাট্টু ছুঁড়েচে আকাশে, তারপর তেলোটা চিত করে হাতটা বাড়িয়েছে ধরবে বলে—হঠাৎ দেখি ওস্তাদ হাত টেনে নিয়ে দু' হাত দিয়ে বুক চেপে দুমড়ে গেল । লাট্টু আকাশ থেকে নেমে এসে ওস্তাদের পিঠের দুই পাখনার মধ্যিখানে শিরদাঁড়ার উপর পড়ে ঘুরতে লাগল—পাবলিক ক্ল্যাপ দিচ্ছে, ভাবছে বুঝি নতুন খেলা—কিন্তু ওস্তাদ আর সোজা হলেন না ।'

লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে জানালার বাইরে চেয়ে থেকে বোধ হয় ওস্তাদের কথাই ভাবল । তারপর বলল, 'উপেনদাকে বলে দেখব, যদি তোমার একটা হিল্লে করে দিতে পারেন । অবিশ্যি পুলিশ লাগবে তোমার পেছনে সেটা বলে

দিলাম ।'

ওর মুখ আবার শুকিয়ে গেল । লোকটা বলল, 'নিয়মমতো তোমাকে আমার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত ।'

'না-না !'—ও এবার বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠল ।

'ভয় নেই', লোকটা একটু হেসে বলল, 'আর্টিস্টের নিয়মগুলো একটু আলাদা । নিয়ম যদি মানতাম গোড়া থেকেই, তাহলে তোমার সঙ্গে আজ এইভাবে থার্ড কেলাসে বসে কথা বলতে হত না । নিয়ম মানলে এই আপিস ভাঙার টাইমে অরুণ মুস্তাফি হয়তো ফিয়াট গাড়ি হাঁকিয়ে বি বি ডি বাগ থেকে বালিগঞ্জে ফিরত ।'

একটা লোকের নাম ওর মাথায় ঘুরছিল । ও জিজ্ঞেস করল, 'উপেনদা কে ?'

লোকটা বলল, 'উপেনদা হল উপেন গুঁই । বেনটিং ইস্ট্রীটে চায়ের দোকান আছে ।'

'হিল্লে কাকে বলে ?'

'হিল্লে মানে গতি । যাকে বলে ব্যবস্থা । —তুমি নিঘ্‌ঘাৎ সাহেব ইস্কুলে পড়েছ ।'

॥ ৪ ॥

দারোগা দীনেশ চন্দ আরেকবার রুমালটা বার করে কপালের ঘামটা মুছে একটা কেঠো হাসি হেসে বললেন, 'আপনি অতটা ইয়ে হবেন না স্যার । আমরা তো অনুসন্ধান চালিয়েই যাচ্ছি । আমরা—'

'মুণ্ডু !'—হেঁকে উঠলেন মিস্টার সান্যাল । 'আমার ছেলে কী অবস্থায় আছে সেটাই বলতে পারছেন না আপনারা !'

'মানে, ব্যাপারটা—'

'আপনি থামুন । আমাকে বলতে দিন । আমি আপনাদের কথাই বলছি । —চারজন লোক, এ গ্যাঙ অফ ফোর, বাবলুকে কিডন্যাপ করেছিল । তারা একটা নীল রঙের চোরাই অ্যামবাসাডরে করে ওকে নিয়ে ঘাটশিলা ছাড়িয়ে সিংভূমের দিকে যাচ্ছিল ।'

'ইয়েস স্যার ।'

'ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার করার দরকার নেই, আমাকে শেষ করতে দিন । ...পথে একটা লরি ওদের গাড়িতে ধাক্কা মেরে পালায় । মাঝরাত্তিরে । লরিটাকে পরে আপনারা ধরেছেন ।'

'ইয়েস—' দারোগা সাহেব স্যারের আগে ব্রেক কষে নিজেকে কোনোমতে সামলে নিলেন।

'অ্যাকসিডেন্টে দু'জন লোক মারা যায়। সেই চারজনের মধ্যে দু'জন।'

'বঙ্কু ঘোষ আর নারায়ণ কর্মকার।'

'কিন্তু দলের পাণ্ডা বেঁচে আছে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী নাম তার?'

'তার আসল নামটা ঠিক জানা নেই।'

'চমৎকার।—কী নামে জানেন তাকে?'

'স্যামসন।'

'আর অন্যটি?'

'রঘুনাথ।'

'এও ছদ্মনাম?'

'হতে পারে।'

'যাক্‌গে।...স্যামসন আর রঘুনাথ বলছেন বেঁচে আছে—অ্যাকসিডেন্টের পরে তারা পালায়। আর আপনারা বলছেন, বাবলু গাড়ি থেকে ছিটকে বাইরে পড়ে।—'

'আজ্ঞে, দশ-বারো বছরের ছেলের সাইজের একটা জুতোর সোলের খানিকটা পাওয়া গেছে গাড়ি থেকে সাত হাত দূরে। রাস্তার পাশটা খানিকটা ঢালু হয়ে জঙ্গলের দিকে নেমে গেছে, সেই স্লোপের নিচের দিকে। তাছাড়া রক্তের দাগও পাওয়া গেছে তার আশেপাশে। আর একটি নতুন ক্যাডবেরি চকোলেটের প্যাকেট।'

'কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি।'

'না স্যার।'

'জঙ্গলের ভিতর সার্চ করা হয়েছে? নাকি বাঘের ভয়ে সেটা বাদ গেছে?'

দারোগাবাবু হালকাভাবে হাসতে গিয়ে না পেরে কেশে বললেন, 'ও জঙ্গলে বাঘ নেই স্যার। জঙ্গলে তো সার্চ করেইছি, এমন-কি কাছাকাছির গ্রাম ক'টাও বাদ দিইনি।'

'তাহলে আপনারা কী রিপোর্ট করতে এসেছেন আমার কাছে? সমস্ত ব্যাপারটা তো জলের মতো পরিষ্কার। স্যামসন আর রঘুনাথ বাবলুকে নিয়েই পালিয়েছে।'

দারোগা হাত তুলে মিস্টার সান্যালের কথা বন্ধ করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে মনে করে হাতটা নামিয়ে বললেন, 'একটা আশার আলো দেখা গেছে, সেইটেই আপনাকে—'

'ওসব আলো-টালো থিয়েটারি বাদ দিয়ে সোজাসুজি বলুন।'

দারোগাবাবু আরেকবার কপালের ঘাম মুছে নিয়ে বললেন, 'অমরনাথ ব্যানার্জি বলে এক ভদ্রলোক—জুট কর্পোরেশনে কাজ করেন—ঘাটশিলা থেকে কলকাতা ফিরছিলেন মোটরে করে ওই অ্যাকসিডেন্টের পরের দিন। উনি ঘাটশিলায় বাড়ি করেছেন; বৌ আর ছেলেকে—'

'ফ্যাকড়া বাদ দিন।'

'হ্যাঁ স্যার, সরি স্যার।—খড়গপুর থেকে ত্রিশ মাইল আগে একটা লরিতে একটি ছেলেকে দেখেন। তার হাতে পায়ে ইনজুরি ছিল। লরির ড্রাইভার বলে ছেলেটিকে নাকি রাস্তায় অজ্ঞান অবস্থায় কুড়িয়ে পায়, অ্যাকসিডেন্টের জায়গা থেকে মাইলখানেক উত্তরে, মেন রোডে। ভদ্রলোক ছেলেটিকে নিয়ে খড়গপুরে একটা ডাক্তারখানায় যান। সেখানে ফার্স্ট এড দেবার পর ছেলেটি বাথরুমে যাবার নাম করে পালায়। ভদ্রলোক পুলিশে রিপোর্ট করেন।'

দারোগাবাবু থামলেন। মিস্টার সান্যাল এতক্ষণ তাঁর কাঁচের ছাউনি দেওয়া প্রকাণ্ড টেবিলটার উপর দৃষ্টি রেখে ভুরু কুঁচকে কথাগুলো শুনছিলেন, এবার দারোগাবাবুর দিকে চোখ তুলে বললেন, 'এত কথা বললেন, আর ছেলেটিকে তার নামটা বলেছে কিনা বললেন না?'

'ওইখানে একটা মুশকিল হয়েছে স্যার। ছেলেটির বোধহয় লস্ অফ মেমরি হয়েছে।'

'লস্ অফ মেমরি?'—অবিশ্বাসে মিস্টার সান্যালের নাক চোখ ভুরু সব একসঙ্গে কুঁচকে গেল।

'সে নিজের নাম, আপনার নাম, কোথায় থাকে, কিচ্ছু নাকি বলতে পারেনি।'

'ননসেন্স!'

'অথচ চেহারার বর্ণনায় দস্তুরমতো মিল আছে!'

'কী-রকম? রঙ ফরসা, দোহারা চেহারা, চুল কোঁকড়া—এই তো?'

'আজ্ঞে নীল প্যান্ট আর সাদা শার্টের কথাও বলেছে।'

'আর কোমরে জন্মদাগ বলেছে? থুতনির নিচে তিলের কথা বলেছে?'

'না স্যার।'

মিস্টার সান্যাল চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর হাতঘড়িটার দিকে দেখে বললেন, 'আজকে আমাকে কোর্টে যেতেই হবে। এ তিনদিন পারিনি দুশ্চিন্তায়। আমার তিন ছেলেকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি। একটি আবার খড়গপুরে আছে—আই আই টি-তে। ফোন করেছিল—আজই আসবে। অন্য দুটি বম্বে আর ব্যাঙ্গালোরে। আসবে নিশ্চয়ই, হয়তো দু-একদিন দেরি হবে।

চিন্তা সবচেয়ে বেশি মাকে নিয়ে। বাবলুর মা নয়, আমার মা। বাবলুর মা বেঁচে থাকলে এ শক্ সইতে পারত না। আমি রাস্তা ঠিক করে ফেলেছি। ওই লোক দুটো যদি বাবলুকে নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে টাকা ডিমান্ড করবেই। যদি করে তো আমি সে টাকা দেব, দিয়ে ছেলেকে ছাড়িয়ে নেব। তারপর তারা ধরা পড়ল কি না-পড়ল, সেটা আপনাদের লুক-আউট, আই ডোন্ট কেয়ার।'

কথাটা বলে কলকাতার জাঁদরেল ব্যারিস্টার শরদিন্দু সান্যাল তাঁর তিনদিক-বইয়ে-ঠাসা আপিস-ঘরের শ্বেতপাথরের মেঝেতে জুতোর আওয়াজ তুলে দারোগা দীনেশ চন্দের কপালে নতুন করে ঘাম ছুটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

॥ ৫ ॥

উত্তর কলকাতার একটা অখ্যাত চুল-ছাঁটাইয়ের দোকানে (প্রোঃ নরহরি দত্তরায়) দুটি লোক ঢুকে দুটো পাশাপাশি চেয়ারে বসে বিশ মিনিটের মধ্যে নিজেদের চেহারা সম্পূর্ণ পালটে নিল। যে বেশি জোয়ান আর বেশি লম্বা, যার কাঁধ দুটো ধরে পরেশ নাপিত চমকে উঠেছিল, তার ছিল চাপদাড়ি আর গোঁফ আর মাথায় কাঁধ অবধি চুল। তার দাড়িগোঁফ বেমালুম সাফ হয়ে গেল, তার মাথার চুল হয়ে গেল দশ বছর আগে বেশির ভাগ লোক যে-রকম চুল রাখত সেইরকম। অন্য লোকটির ঝুলপি বাদ হয়ে গেল, সিঁথি ডান দিক থেকে বাঁ দিকে চলে গেল, খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফের জায়গায় রয়ে গেল শুধু একটা সরু গোঁফ। পরেশ আর পশুপতি তাদের পাওনার উপরি পেল ষণ্ডা লোকটার কাছ থেকে এমন একটা মুখ-বন্ধ-করা চাহনি যেটা তারা কোনোদিন অমান্য করতে পারবে না।

চুল ছাঁটার বিশ মিনিট পরে লোক দুটি শোভাবাজারের একটা গলিতে একটা ঘুণধরা একতলা বাড়ির কড়া নাড়ল। দরজা খুললেন একজন বেঁটে শুকনো বুড়ো ভদ্রলোক। ষণ্ডা লোকটি তাঁর বুকের উপর পাঁচটা আঙুলের ডগার চাপ দিয়ে তাঁকে ভিতরে ঠেলে দিয়ে নিজেও ঢুকে গেল, আর সেইসঙ্গে অন্য লোকটাও ঢুকে ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। সময়টা সন্ধ্যা, ঘরে টিমটিম করে জ্বলছে একটা বিশ পাওয়ারের বাল্‌ব।

'চিনতে পারছ দাদু?'—বলল ষণ্ডা লোকটা বুড়োর উপর ঝুঁকে পড়ে।

বুড়োর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। মাথার কাঁপুনির চোটে ইস্পাতের ফ্রেমের আদ্যিকালের চশমাটা নাকের উপর নেমে আসছে।

'কই-কে-কই না তো...'

ষণ্ডা লোকটা একটা বিশ্রী হাসি হেসে বলল, 'দাড়ি কামিয়েছি যে!—এই

দ্যাখো—'

লোকটা বুড়োর মাথাটা টেনে এনে চশমাসুদ্ধু নাকটা নিজের গালে ঘষে দিল।

'গন্ধ পাচ্ছ না দাদু? শেভিং সোপের খুশ্‌বু? আমার নাম যে স্যামসন। এবার মনে পড়ছে?'

বৃদ্ধ এবার কাঁপতে কাঁপতে তক্তপোশে বসে পড়লেন, কারণ লোকটা তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে।

'তোমার হুঁকো খাবার সময় ডিসটার্ব দিলুম—ভেরি সরি দাদু!'

স্যামসন দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো হুঁকোটাকে তুলে নিয়ে কলকেটা মাথা থেকে খুলে নিল। তক্তপোশের উপর একটা ডেস্ক, তার উপর একটা খোলা পাঁজি। পাঁজির পাতার উপর চাপা দেওয়া একটা ছ'কোনা পাথরের পেপারওয়েট। স্যামসন পেপারওয়েটটা সরিয়ে কলকেটা পাঁজির উপর ধরে উপুড় করতেই টিকেগুলো পাঁজির পাতার উপর পড়ল। তারপর কলকেটা ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা হাতল-ভাঙা চেয়ার টেনে নিয়ে তক্তপোশের সামনে বুড়োর মুখোমুখি বসে বলল, 'এবার বল তো দিকি দাদু—গাঁট যদি কাটার ইচ্ছে থাকে তো সোজাসুজি কাটতেই হয়; গনৎকারীর ভড়ং ধরেচ কেন?'

বুড়ো কোন্‌দিকে চাইবেন বুঝতে পারছেন না। পাঁজির পাতা থেকে ধোঁয়া উঠতে থাকে ঘরটার কড়িবরগার দিকে, পাতায় কালশিটে পড়ে গর্ত হয়ে যাচ্ছে, তামাকের গন্ধের সঙ্গে পোড়া কাগজের গন্ধ মিশে যাচ্ছে।

স্যামসন তার ঝাঁঝালো ফিসফিসে গলায় বলে চলল, 'সেদিন যে এলুম—এসে বললুম একটা বড় কাজে হাত দিতে যাচ্ছি, একটা ভালো দিন দেখে দাও। তুমি বই দেখে হিসেব করে বললে আষাঢ়ের সাতুই। লোকে বলে বাড়ির আলসেতে কাগ এসে বসলে ভৈরব ভট্‌চায তার ভাগ্য গুনে দিতে পারে। আমরাও বিশ্বাস করে এলুম, তুমি বলে-টলে গাঁট থেকে দশটি টাকা বার করে নিয়ে তোমার ওই কাঠের বাক্সের মধ্যে গুঁজে রেখে দিলে। তারপর কী হয়েচে জান?'

গনৎকার মশাই পাঁজি থেকে চোখ সরাতে পারছেন না বলেই বোধহয় রঘুনাথ লোকটি তাঁর থুতনি ধরে মুখটা ঘুরিয়ে স্যামসনের দিকে করে দিল। আর সেইসঙ্গে দুটো চোখের পাতাও আঙুল দিয়ে টেনে খুলে রাখল, যাতে ভট্‌চায মশাই স্যামসনের মুখ থেকে চোখ সরাতে না পারেন। চোখের ব্যাপারটা করার আগে অবিশ্যি রঘুনাথ ভট্‌চাযের চশমাটি খুলে তক্তপোশের উপর ফেলে দিয়েছিল।

'বলছি শোন', বলল স্যামসন, 'যে গাড়িতে করে মাল নিয়ে যাচ্ছিলাম, এক শালা লরি তাতে মারে ধাক্কা। গাড়ি খোলামকুচি। লরি ভাগলওয়া। দো পার্টনার খতম। স্পট ডেড। আমার লোহার শরীর, তাই জানে বেঁচে গেছি। তাও মালাইচাকি ডিসলোকেট হতে হতে হয়নি। আর এই যে—এ আমার পার্টনার—এর তিনি জায়গা জখম, ডান পাশে ফিরে ঘুমুতে পাচ্চে না! ওদিকে যার জন্যে এত মেহনত—সে মালটিও খতম।...এসব তুমি গুনে পাওনি কেন?'

'আমরা তো বাবা ভগবান—'

'চ্যাওপ্!'

রঘুনার বুড়োর মাথাটা ছেড়ে তাকে খানিকটা রেহাই দিল, কারণ বাকি খেলাটা স্যামসন একাই খেলবে।

'এবার বার করো তো দেখি দাদু দশ ইনটু দশ।'

'আ-আমি—'

'চ্যাওপ্!'

স্যামসনের চাপা চিৎকারের সঙ্গে তার হাতে একটা ছুরি এসে গেল, আর তার ভাঁজ-করা অদৃশ্য ফলাটা হাতলে একটা বোতাম টেপার ফলে সড়াৎ শব্দে খুলে গেল।

ছুরিসমেত হাতটা গনৎকারের দিকে এগিয়ে এল।

'দিচ্ছি বাবা, দিচ্ছি বাবা, দিচ্ছি।'

ভৈরব জ্যোতিষীর থরথরে হাত প্রথমে তাঁর ট্যাঁক, তারপর তাঁর তেলচিটে-পড়া কাঠের ক্যাশবাক্সটার দিকে এগিয়ে গেল।

॥ ৬ ॥

এই পাঁচ দিনে ফটিক তার কাজ বেশ কিছুটা শিখে নিয়েছে। উপেনবাবু লোক ভালো হওয়াতে অবিশ্যি খুব সুবিধে হয়েছে। তিনি ফটিককে বারো টাকা মাইনে, থাকার জায়গা, আর খেতে দেবেন। এস মাসের মাইনে আগাম দিয়েছেন। উপেনবাবু যে লোক ভালো, সেটা ফটিক সত্যি করে বুঝেছে গতকাল। কাছেই একটা পানের দোকান থেকে উপেনবাবুর জন্য পান আনতে গিয়ে বিশু বলে আরেকটা পানের দোকানের ছেলের সঙ্গে ফটিকের আলাপ হয়। বিশুও সবে মাসখানেক হল কাজে ঢুকেছে। ঢোকার দু'দিনের মধ্যে সে একটা চায়ের কাপ ভাঙে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার একগোছা চুল মালিক বেণীবাবুর হাতে উঠে আসে, আর তার পরেই এক রাবুণে গাঁট্টার চোটে মাথায় আলু বেরিয়ে যায়।

উপেনবাবু মারেন না। তিনি ধমক দেন, আর ধমকটা অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে, আর ক্রমে সেটা বদলে গিয়ে একঘেয়ে উপদেশ হয়ে যায়। এই উপদেশটা খেপে খেপে দিনের শেষ অবধি চলতে থাকে। দ্বিতীয় দিনে ফটিক যখন কাচের গেলাসটা ভাঙল, তখন উপেনবাবু প্রথমে মেঝেতে ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর ফটিক যখন টুকরোগুলো গামছায় তুলছে, তখন তিনি মুখ খুললেন।—

'কাঁচের জিনিসটা যে ভাঙলে, কিনতে পয়সা লাগে না? পয়সাটা দিচ্ছে কে? তুমি না আমি? এসব কথাগুলো কাজের সময় খেয়াল রেখো। কাজে ফুর্তি চাই ঠিকই, তার মানে এই নয় যে, হাতে গেলাস নিয়ে লাফাতে হবে। দোকানের জিনিসপত্তর হাতে নিয়ে ভোজবাজি করার জিনিস নয়।'

উপদেশের কথাগুলো যে উপেনবাবু ঠিক শোনাবার জন্য বলেন তা নয়। দোকানের গোলমালের মধ্যেই ফটিক লক্ষ করেছিল ওঁর ভুরু কুঁচকানো আর ঠোঁট দুটো নড়ছে। খদ্দেরের অর্ডার নিয়ে ওদিকে যেতে ওঁর দু-একটা কথা ফটিকের কানে এসে গেছিল। উপদেশ দেবার সময় উপেনবাবু কাজ থামান না, এটা ফটিক লক্ষ করেছে।

দোকানে নতুন মুখ যে রোজ দেখা যায় তা নয়। বেশির ভাগই যারা আসে তারা রোজই আসে, আর তাদের খাবার সময়টা বাঁধা। শুধু সময় না, অর্ডারটাও বাঁধা। কেউ শুধু চা, কেউ চা-টোস্ট, কেউ চা-ডিম-টোস্ট—এইরকম আর কি। ডিম মানে হয় ডিম পোচ, না-হয় ডিমের মামলেট। কে কী অর্ডার দেয়, সেটা ফটিক এর মধ্যেই বুঝে ফেলতে শুরু করেছে। আজ সকালে সেই রোগা লিকলিকে লোকটা—যে ভীষণ দুঃখ-দুঃখ মুখ করে থাকে—সে এসে তিন নম্বর টেবিলে বসতেই ফটিক তার কাছে গিয়ে বলল, 'চা আর মাখন-ছাড়া টোস্ট?' লোকটা সেইরকমই দুঃখ-দুঃখ মুখ করে বলল, 'চিনে ফেলেছিস এর মধ্যেই?'

লোক চিনে রাখার মধ্যে ফটিক একটা বেশ মজা পেয়ে গেছে। তবে একটু সাবধানে চলতে হবে, কারণ আজই দুপুরে ও একটা ভুল করে বসেছিল। একজন হলদে শার্টপরা মোটা লোককে দেখে চেনা মনে করে যেই বলেছে, 'চা আর ডবল ডিমের মামলেট?'—অমনি লোকটা হাতের খবরের কাগজ সরিয়ে ফটিকের দিকে ভুরু তুলে বলল, 'তোর মর্জিমাফিক খেতে হবে নাকি?'

যেটা ফটিকের সবচেয়ে ভালো লাগছে সেটা হল যে, কাপ-ডিস নিয়ে চলাফেরাটা ওর ক্রমে সহজ হয়ে আসছে। হারুনদা বলেছিল, 'দেখবি এসব আস্তে আস্তে কেমন সড়গড় হয়ে আসবে। তখন দেখবি কাজটা একেবারে নাচের ছকে বাঁধা হয়ে গেছে। আসলে এটাও একটা আর্ট। সেই আর্টটা যদ্দিন রপ্ত না হচ্ছে, তদ্দিন মাঝে মাঝে দু-একটা করে জিনিসপত্তর ভাঙবেই।'

হারুনদা রোজই বিকেলে একবার আসে। উপেনবাবুকে অবিশ্যি আসল ব্যাপার কিছু বলেনি। ফটিক হয়ে গেছে হারুনের দূর সম্পর্কের ভাই, মেদিনীপুরে থাকে, বাপ-মা কেউ নেই, এক খিটখিটে খুড়ো আছে যে গাঁজা খায় আর ফটিককে ধরে বেধড়ক মারে।—'দেখছেন উপেনদা—লোকটা স্রেফ খামচে দিয়ে কনুইয়ের ছাল-চামড়া তুলে দিয়েছে। মাথায় ফোলাটা দেখছেন ?—চ্যালাকাঠের বাড়ি।' উপেনবাবুও এক কথায় রাজী। যে ছেলেটি আছে তাকে নাকি আর রাখা যাচ্ছে না। সে নাকি পর পর তিনদিন ফাঁকি দিয়ে হিন্দি ফিলিম দেখতে গিয়ে রাত করে ফিরে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলে দোষ ঢাকতে গিয়েছিল।

ফটিকের চেহারার বদল হয়েছে। তার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল কাটিয়ে ছোট করে দিয়েছে হারুনদা। তাতে অবিশ্যি ফটিক কোনো আপত্তি করেনি। চুল ছাঁটার পরে হারুনদা যখন ওকে এক জোড়া নতুন হাফপ্যান্ট, দুটো শার্ট, দুটো হাতকাটা গেঞ্জি আর এক জোড়া চটি কিনে দিয়ে বলল, 'কাজের সময় গেঞ্জি পরবি, তবে পরার আগে একটু চায়ের জলে চুবিয়ে শুকিয়ে নিবি'—তখন ফটিকের হঠাৎ কেন জানি গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। বোধহয় কাজ কথাটা শুনে নিজেকে বড় মনে হওয়ার জন্যেই। কাজটা তার অভ্যেস হয়ে যাবে এটা ফটিক জানে। সকাল সাড়ে-আটটা থেকে রাত আটটা অবধি হপ্তায় পাঁচ দিন। শনিবার চারটে অবধি, আর রবিবার ছুটি। দোকানের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে উপেনবাবুর ছোট কাঠের ঘর, আর সেই ঘরের দরজার বাইরে টিনের ছাউনির তলায় ফটিকের নিজের শোবার জায়গা। প্রথম রাত মশার কামড়ে ঘুম হয়নি, তাই চাদরটা পা থেকে মাথা অবধি জড়িয়ে নিয়েছিল, কিন্তু নিশ্বাসের কষ্ট হওয়াতে বেশিক্ষণ সেভাবে থাকতে পারেনি। পরদিন উপেনবাবুকে বলাতে উনি একটা মশারি এনে দিলেন। তারপর থেকে ঘুম ভালোই হচ্ছে। কনুইয়ের ঘা-টা শুকিয়ে এসেছে, মাথার ব্যথাটা মাঝে মাঝে চলে যায় আবার মাঝে মাঝে ফিরে আসে। যেটা একেবারেই ফিরে আসে না সেটা হল, সেদিন সেই আকাশে তারা দেখার আগের ঘটনাগুলো। ও বুঝেছে ও নিয়ে ভেবে কোনো লাভ নেই। হারুনদাও বলেছে যে, যে-জিনিসটা নেই, যেটা শুন্যি, সেটা নিয়ে ভাবা যায় না। 'মনে পড়লে আপনিই পড়বে রে ফটিক !'

আসল মজা হয়েছিল গতকাল। গতকাল ছিল রবিবার। হারুনদা বলে দিয়েছিল, তাই ফটিক দোকানেই ছিল। হারুনদা এল দুটোর সময়, সঙ্গে কাঁধে ঝোলানো একটা থলি। অনেক রঙচঙে কাপড়ের টুকরো পাশাপাশি সেলাই করে তৈরি হয়েছে থলিটা। ফটিক হারুনের সঙ্গে উপেনবাবুর দোকান থেকে বেরিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল শহীদ মিনার।

এ-রকম যে একটা জায়গা থাকতে পারে, সেটা ফটিক ভাবতেই পারেনি। মিনারের একটা দিকে মানুষ ছাড়া আর কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। এত মানুষ এক জায়গায় এক সঙ্গে কী করতে পারে, সেটা ফটিকের মাথায় ঢুকল না। হারুন বলল, 'মিনারের চুড়োয় যদি উঠতে পারতিস তাহলে দেখতিস, এই ভিড়টার মধ্যে একটা নকশা আছে। দেখতিস ভিড়ের মাঝে মাঝে এক-একটা গোল চক্করের মতো ফাঁকা জায়গা। সেই ফাঁকটার প্রত্যেকটাতে একটা কিছু ঘটছে, আর সেইটে দেখবার জন্য গোল হয়ে লোক দাঁড়িয়েছে।'

'রোজ এত লোকের ভিড় হয় এখানে ?' ফটিক জিজ্ঞেস করল।

'ওনলি সানডে', বলল হারুন, 'চ তোকে দেখাচ্ছি। দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবি।'

ফটিক দেখল বটে, কিন্তু বুঝল বললে একটু বেশি বলা হবে। এত বিরাট ব্যাপার সহজে বোঝা যায় না। এত রকম কাজ, এত রকম খেলা, এত রকম ভাষা, এত রকম রঙ আর এত রকম শব্দ এক জায়গায় এসে জড়ো হয়েছে যে, ফটিকের চোখ-কান-মাথা সব এক সঙ্গে ধাঁধিয়ে গেল। শুধু যে খেলা হচ্ছে তা তো নয়। একটা দিকে কেবল জিনিস ফেরি হচ্ছে—দাঁতের মাজন, দাদের মলম, বাতের ওষুধ, চোখের ওষুধ, নাম-না-জানা শুকিয়ে যাওয়া শেকড় বাকল, আর আরো কত কী। এক জায়গায় একটা টিয়া পাখি এক গোছা কাগজের মধ্যে থেকে একটা করে কাগজ ঠোঁট দিয়ে টেনে বার করে লোকের ভাগ্য বলে দিচ্ছে। একজন লোক কথার তুবড়ি ছেড়ে একরকম আশ্চর্য সাবানের তারিফ করছে—লোকটার মাথায় পাগড়ি, গায়ে খাকী প্যান্ট আর দু-হাতে গোলাপী সাবানের ফেনা। একদিকে একটা লোক গলায় একটা ইয়া মোটা লোহার শিকল ঝুলিয়ে হাত-পা নেড়ে কী জানি বলছে, আর তার চারদিকের লোক হাঁ করে তার কথা শুনছে। তার কাছেই একটা সিমেন্ট-বাঁধানো জায়গার উপর পা ছড়িয়ে বসে একটা ভীষণ ময়লা কাপড়পরা কুচকুচে কালো ঝাঁকড়া-চুলো পাগলাগোছের লোক লাল, কালো আর সাদা খড়ি দিয়ে আশ্চর্য সুন্দর দেবদেবীর ছবি আঁকছে। লোক চারপাশ থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে পয়সা ফেলছে, সেগুলো ঠং ঠং করে হনুমানের ল্যাজে, রামচন্দ্রের মুকুটে, রাবণের মাথার উপর পড়ছে, কিন্তু লোকটা সেগুলোর দিকে দেখছেই না।

তবে এটা ফটিক দেখল যে, যেসব জিনিস হচ্ছে তার মধ্যে খেলাটাই সবচেয়ে বেশি। কেবল একটা জিনিসকে ফটিক খেলা বলবে না কী বলবে ভেবেই পেল না—ফটিকের চেয়েও কয়েক বছরের ছোট একটি ছেলে মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে নিজের মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর মাথার চারপাশে মাটি চাপা দিয়ে বাতাস ঢোকার ফাঁকটাও বন্ধ করে দিয়েছে আরেকটি

বাচ্চা ছেলে। এইভাবে ছেলেটা চিত হয়ে পড়ে আছে তো পড়েই আছে। ফটিক কিছুক্ষণ দেখে ঢোক গিলে বলল, 'ও হারুনদা, ও যে মরে যাবে!'

'এখানে কেউ মরতে আসে না রে ফটকে', বলল হারুন,—'এখানে আসে বাঁচতে। ও-ও বেঁচে যাবে। ও যা করছে সেটা স্রেফ অভ্যাসের ব্যাপার। অভ্যাসে কী যে হয় সেটা খলিফ হারুনের খেলা দেখলে বুঝবি।'

হারুন ওকে নিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে দিয়ে যেখানে ও আগে খেলা দেখাত সেই জায়গায়। সেখানে এখন একটা মেয়ে খেলা দেখাচ্ছে। দড়ির উপর ব্যালান্সের খেলা। মাটি থেকে প্রায় সাত-আট হাত উঁচুতে টান করে বাঁধা দড়ির উপর দিয়ে দিব্যি এ-মাথা থেকে ও-মাথা চলে যাচ্ছে মেয়েটা। 'মাদ্রাজের মেয়ে', বলল হারুনদা।

আরেকটা জায়গায় একটা শূন্যে ঝোলানো লোহার রিং-এর গায়ে আট-দশটা জায়গায় আগুন জ্বলছে দেখে ফটিক হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ওর ভিতর দিয়ে একটা লোক লাফাবে বুঝি?'

হারুন হাঁটা থামিয়ে ওর দিকে দেখল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোর মনে পড়ে গেছে? তুই আগে দেখেছিস এ জিনিস?'

ফটিক 'হ্যাঁ' বলতে গিয়েও পারল না। একটা আলো-বাজনা-ভিড় মেশানো ছবি এক মুহূর্তের জন্য ওর চোখের সামনে ভেসে উঠে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেছে। এখন শুধু সামনে যা দেখতে পাচ্ছে তাই।

হারুন আবার এগিয়ে গেল, ফটিক তার পিছনে।

যে জায়গাটায় হারুন খেলা দেখাবে সেখানে এখন কেউ নেই। ডান দিকে একটা ভিড়ের পিছন থেকে ডুগডুগির শব্দ আসছে, ফটিক মানুষের পায়ের ফাঁক দিয়ে ভাল্লুকের কালো লোম দেখতে পেয়েছে। ডুগডুগি আর ঢোলক এখানে সব খেলাতেই বাজায়, কিন্তু হারুন থলি থেকে যেটা বার করল সেটা দুটোর একটাও নয়। সেটা একটা বাঁশি; যেটার পিছন দিকটা সরু আর সামনের দিকটা চওড়া আর ফুলকাটা। সাতবার পর পর ফুঁ দিল বাঁশিটায় হারুনদা। ফটিক জানে যে, সব শব্দ ছাপিয়ে বাঁশির শব্দ শোনা গেছে ময়দানের এ-মাথা থেকে ও-মাথা।

এবার বাঁশিটা ওয়েস্টকোটের পকেটে রেখে হারুন একটা চিৎকার দিয়ে চমকে দিল ফটিককে।

'ছু-উ-উ-উ-উ!
ছু-ছু-ছু-ছু-ছু-উ-উ-উ!'

এই এক ডাক আর বাঁশির আওয়াজেই এখান থেকে ওখান থেকে ছেলের দল

ছুটে আসতে আরম্ভ করেছে হারুনের দিকে। তারা এসে দাঁড়াতেই হারুন একটা কান-ফাটানো তালি দিয়ে তিনবার পাক খেয়ে একটা ডিগবাজি আর একটা পেল্লায় লাফ দিয়ে তার আশ্চর্য লোক-ডাকার মন্ত্রটা শুরু করে দিল—

'ছু-ছু-ছু-ছু-ছু-উ-উ-উ!
ছু মন্তর যন্তর ফন্তর
হর্ বিমারি দূর করন্তর
সাত সমন্দর বারা বন্দর
চালিস চুহা ছে ছুছুন্দর
ছু-উ-উ-উ!'

ছু বলেই বাঁশিতে আরেকটা লম্বা ফুঁ দিয়ে আরেকটা তালি আর আরেকটা ডিগবাজির পর আবার ধরল হারুনদা—

'কাম্! কাম্! কাম্! কাম!
'কাম-ম-ম-ম-ম-ম!
কাম সী কাম্ সী চমকদারি
হর্ কিস্‌ম্ কি জাদুকারি
কলকত্তে কি খেল-খিলাড়ী
লম্বি দাড়ি লং সুপারি
কাম্-ম-ম-ম-ম-ম্!

কাম্ কামান্ডর ওয়ান্ডর ওয়ান্ডর
জাগলর জোকার জাম্পিং ওয়ান্ডর
ওয়ান্ডর খালিফ হারুন ওয়ান্ডর
ভেল্‌কী ভেলকাম্ কাম্ কমাকম
কাম্-ম-ম-ম-ম!

কামবয় গুডবয় ব্যাডবয় ফ্যাটবয়
হ্যাটবয় কোটবয় দিস-বয় দ্যাট-বয়
কালিং অলবয়, অলবয় কালিং
কালিং কালিং কালিং কালিং
কাম্-ম-ম-ম-ম-ম্!'

বাপ্‌রে, ভাবল ফটিক, কী গলার জোর, কী লোকডাকার কায়দা! এরই মধ্যে বেশ লোক জমে গেছে হারুনদাকে ঘিরে। হারুন তার থলি থেকে একটা

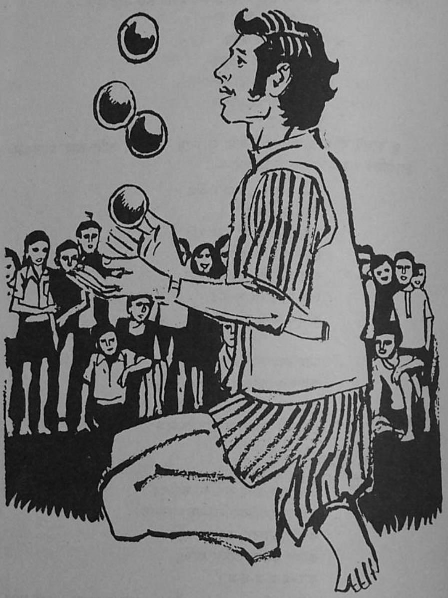

চকরাবকরা আসন বার করে ঘাসের উপর বিছাল। তারপর তার উপর বসে থলিতে যা কিছু খেলার সরঞ্জাম ছিল, সব একে একে বার করে নিজের দু-পাশে সাজিয়ে রাখল।

ফটিক দেখল, চারটে নকশা-করা ঝকঝকে পিতলের বল, দুটো প্রকাণ্ড লাট্টু, তার জন্য মানানসই লেত্তি, তিন-চারটে লাল নীল পালক লাগানো বাঁশের কঞ্চি, পাঁচ রকম নকশা-করা টুপি—যার একটা হারুনদা মাথায় পরে নিল। ফটিক এতক্ষণ হারুনকে জিনিস সাজিয়ে রাখতে সাহায্য করছিল, এবার হারুন বলল, 'তুই ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়া, এক-একটা খেলা যেই শেষ হবে অমনি তালি দিবি।'

প্রথম দুটো খেলার পর ফটিকই তালি শুরু করল, তারপর অন্যরা দিল। তিন নম্বর খেলা থেকে ফটিককে আর ধরিয়ে দেবার দরকার হয়নি। সত্যি বলতে কি, সে হারুনের কাণ্ডকারখানা দেখে এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে, তালি দেবার কথা আর মনেই ছিল না। শুধু হাতেরই যে কায়দা তা তো নয়। হারুনের কোমর থেকে উপরের সমস্ত শরীরটাই যেন জাদু। নমাজ-পড়ার মতো করে গোড়ালির উপর বসে অত বড় লাট্টুটায় দড়ি পেঁচিয়ে সেটাকে সামনের দিকে ছুঁড়ে লেত্তি ফুরোবার ঠিক আগে পিছন দিকে একটা হ্যাঁচকা টান দিলে সেটা যে কী করে শূন্য দিয়ে ঘুরে এসে আবার হারুনদারই হাতের তেলোয় পড়ছিল—বার বার ঠিক একইভাবেই একই জায়গায় পড়ছিল—সেটা ফটিকের মাথায় কিছুতেই ঢুকছিল না। আর সেখানেই তো শেষ না। লাট্টুটা হাতের তেলো থেকে ওই পালক-লাগানো কাঠির মাথায় বসিয়ে দিল হারুনদা আর ওই বোমা লাট্টুটা ঘুরতে লাগল ওই পেনসিলের মতো সরু কাঠিটার মাথায়। ফটিক ভাবল এটাই বুঝি খেলার শেষ, এখানেই বুঝি হাততালি দিতে হবে, কিন্তু ওমা—হারুনদা মাথা চিত-করে ঘুরন্ত লাট্টু সমেত কাঠিটা বসিয়ে দিয়েছে ওর থুতনির ঠিক মাঝখানে! তারপর হাত সরিয়ে নিতে লাট্টুর সঙ্গে সঙ্গে কাঠিটাও ঘুরতে লাগল থুতনির উপর দাঁড়িয়ে—আর সেই সঙ্গে তার গায়ে লাগানো রঙীন পালকগুলো। তারও পরে ফটিক অবাক হয়ে দেখল যে, কাঠিটা আবার মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে ঘুরছে কিন্তু লাট্টুটা ঘুরে চলেছে একটানা।

পিতলের বলের খেলায় আরো বেশি হাততালি পেল হারুন। দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার বলে চলে গেল জাগ্‌লিং দেখাতে দেখাতে। বিকেলের রোদে এমনিতেই বলগুলো ঝলমল করে উঠছে; সেগুলো থেকে আবার আলো ঠিকরে বেরিয়ে হারুনের মুখে পড়াতে মনে হচ্ছে যেন তার মুখ থেকেই বার বার আলো বেরুচ্ছে।

সূর্য ডুবে যাওয়া অবধি খেলা চলল। শেষের দিকে পাশের খেলা থেকে

অনেক লোক চলে এসেছিল হারুনের খেলা দেখতে। ফটিক অবাক হয়ে দেখছিল বাচ্চারা পর্যন্ত কীরকম পয়সা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে হারুনের চারপাশে। হারুন কিন্তু খেলার সময় সেগুলোর দিকে দেখছেই না। খেলার শেষে ফটিককে ডেকে বলল, 'ওগুলো তোল তো।'

হারুন যতক্ষণে তার ভোজবাজির সরঞ্জাম থলিতে তুলেছে, তার আগেই ফটিকের পয়সা তোলা হয়ে গেছে। গুনে হল আঠারো টাকা বত্রিশ পয়সা। থলি কাঁধে ঝুলিয়ে হারুন বলল, 'চল্, আজ তোকে খাওয়াব—পাঞ্জাবী রুমালি রুটি আর তরখা। নিঘ্‌ঘাৎ এ জিনিস তুই কোনোদিন খাসনি। তারপর মিষ্টি কী খাওয়া যায় সেটা তখন ভেবে দেখা যাবে।'

॥ ৭ ॥

ফটিক তার শোবার জায়গার পাশের দেয়ালে একটা কাত্যায়নী স্টোর্সের ক্যালেন্ডার টাঙিয়ে দিয়েছে। তাতে পেনসিল দিয়ে প্রত্যেক দিনের শেষে সেই দিনের তারিখটার উপর একটা দাগ কেটে দেয়। এইভাবে দাগ গুনে সে হিসেব করে ক'দিন হল তার চাকরি। আট দিনের দিন, তার মানে বিষ্যুদবার, দুপুরে সাড়ে-বারোটার সময় উপেনবাবুর দোকানে একজন লোক এল, যে-রকম ষণ্ডা লোক ফটিক কোনোদিন দেখেনি। দোকানের আটটা বেঞ্চির মধ্যে যেটা দরজা দিয়ে ঢুকেই বাঁ দিকে—মানে যেটা উপেনবাবুর বসার জায়গা থেকে সবচেয়ে দূরে—সেখানে বসেছে লোকটা। তার সঙ্গে অবিশ্যি আরেকজন লোক আছে ; তার চেহারা মোটেই চোখে পড়ার মতো নয়। ষণ্ডা লোকটা বেঞ্চিতে বসেই একটা 'অ্যাই' করে হাঁক দিয়েছে। ফটিক বুঝল যে তাকেই ডাকা হচ্ছে। থুতনিতে শ্বেতীওয়ালা ভদ্রলোক, যিনি রোজ এই সময় এসে এক কাপ চা সামনে নিয়ে আধ ঘন্টা ধরে খবরের কাগজ পড়েন, তিনি এইমাত্র উঠে গেছেন। ফটিক তাঁর পেয়ালা তুলে নিয়ে টেবিলটা ঝাড়ন দিয়ে মুছছিল, তার মধ্যে ষণ্ডা লোকটা আবার হাঁক দিয়ে উঠল।

'দুটো মামলেট আর দুটো চা এদিকে। জলদি।'

'দিচ্ছি বাবু।'

কথাটা বলতে ফটিকের গলাটা যে কেন একটু কেঁপে গেল, আর তার সঙ্গে হাতের কাপটাও, সেটা ও বুঝতে পারল না। অর্ডারটা কিচেনে কেষ্টদাকে চালান দিয়ে, হাতের কাপটা নামিয়ে রেখে শ্বেতীওয়ালা লোকের পয়সাটা উপেনবাবুর কাছে দিয়ে ফটিক আরেকবার আড়চোখে ষণ্ডা লোকটার দিকে দেখে নিল। ওকে আগে দেখেছে বলে মনে পড়ল না ওর। তাহলে ওর গলা শুনে এমন হল

কেন ? লোক দুটো নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, রোগা লোকটা ষণ্ডাটাকে একটা সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছে।

ফটিক ওদের দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিল। তারপর হাতের ঝাড়নটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে গেল পান্নাবাবুর টেবিলের উপর রুটির গুঁড়ো পরিষ্কার করতে। অন্য যারা এ দোকানে আসে, পান্নাবাবু তাদের চেয়ে অনেক বেশি ভালো জামাকাপড় পরেন। উনি এলে উপেনবাবুও উঠে গিয়ে খাতির-টাতির করেন। আর কেউ যেটা করে না সেটা দু'দিন পান্নাবাবু করেছেন ; ফটিককে দশ পয়সা করে বকশিশ দিয়েছেন। তার মধ্যে একটা দশ আজকে এই পাঁচ মিনিট আগে পেয়েছে ফটিক। ও ঠিক করেছে, বকশিশের পয়সা জমিয়ে ও হারুনদার ধার শোধ করবে।

অমলেট তৈরি হচ্ছে। সবাই বলে মামলেট, কেবল হারুনদা বলে অমলেট, আর সেটাই নাকি ঠিক। ফটিকও তাই মনে মনে অমলেট বলে। কেষ্টদা দু-কাপ চা এগিয়ে দিল, ফটিকও স্টাইলের মাথায় কাপ দুটো হাতে নিয়ে একটুও চা পিরিচে না-ফেলে সে দুটোকে এক নম্বর টেবিলের উপর ষণ্ডা আর রোগাটার সামনে রেখে দিল। একটা জিনিস ও দু'দিন থেকে করতে আরম্ভ করেছে। যেটা দিচ্ছে সেটাও বলে দেয় আর যেটা বাকি সেটাও বলে—তারপরে একটা 'কামিং' জুড়ে দেয়। আজ যেমন বলল, 'মামলেট কামিং।'

কথাটা বলে ষণ্ডাটার দিকে চাইতেই ফটিক দেখল লোকটার মুখটা একটু হাঁ হয়ে গেছে, আর সেই হাঁ-এর ভিতর সিগারেটের না-ছাড়া ধোঁয়াটা পাক খেয়ে আপনা থেকেই ফিতের মতো বেরিয়ে আসছে।

ধোঁয়াটা দেখবার জন্যই ফটিক বোধহয় পাঁচ সেকেন্ডের জন্য দাঁড়িয়েছিল, এবার উলটো ঘুরতেই লোকটা কথা বলল।

'অ্যাই—'

ফটিক থামল।

'তুই কদ্দিন কাজ করছিস ?'

পুলিশ !

হতেই হবে পুলিশ। না হলে ও-রকম জিজ্ঞেস করছে কেন ? ফটিক ঠিক করে নিল বানিয়ে বলবে, কিন্তু আস্তে বলবে, যাতে উপেনবাবু শুনতে না পান। আড়চোখে একবার উপেনবাবুর দিকে চাইতেই দেখল তিনি নেই। যাক্, বাঁচা গেল।

'অনেকদিন বাবু।'

'তোর নাম কী ?'

'ফটিক।'

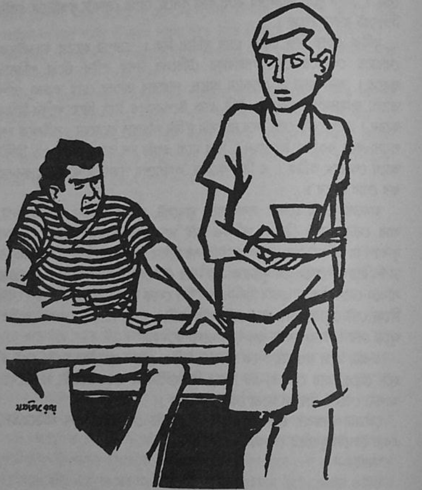

ফটিক তো ওর নিজের বানানো নাম, তাই সেটা বললে কোনো ক্ষতি নেই।
'চুল ছেঁটেছিস কবে ?'
'অনেকদিন বাবু।'
'কাছে আয়।'
ওদিক থেকে কেষ্টদা জানান দিচ্ছে মামলেট রেডি।
'আপনার মামলেট আনি বাবু।'
ফটিক কেষ্টদার কাছ থেকে প্লেট এনে লোক দুটোর সামনে রাখল। তারপর দু-নম্বর থেকে নুন-মরিচ এনে তার পাশে রাখল। যণ্ডা আর অন্য লোকটা এখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, ওর দিকে দেখছে না। ফটিক চার নম্বরের দিকে

চলে গেল। খদ্দের এসেছে।
লোক দুটো খাওয়া শেষ করে যখন ফটিককে পয়সা দেবে তখন যণ্ডা লোকটা বলল, 'তোর হাতে চোট লাগল কী করে ?'
'দেয়ালে ঘষটা লেগেছিল।'
'দিনে ক'টা মিথ্যে বলা হয় চাঁদু ?'
লোকটাকে না চিনলেও, ওর কথাগুলো শুনতে ফটিকের ভালো লাগছিল না। ও ঠিক করল হারুনদা এলে ওকে বলবে।
'জবাব দিচ্ছ না যে ?'
লোকটা এখনো একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওর দিকে। ঠিক এই সময় উপেনবাবু রাস্তার দিকের দরজা দিয়ে ঢুকলেন। ফটিককে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হওয়াতে বললেন, 'কী হয়েছে ?'
ফটিক বলল, 'বাবু জিজ্ঞেস করছিলেন—'
'কী ?'
'আমি কদ্দিন এখানে কাজ করছি তাই।'
উপেনবাবু যণ্ডার দিকে চেয়ে বেশ নরম ভাবেই বললেন, 'কেন মশাই, কী দরকার আপনাদের ?'
যণ্ডা কিছু না বলে পয়সাটা টেবিলের উপর রেখে উঠে পড়ল আর সেই সঙ্গে অন্য লোকটাও। কাজের চাপে বিকেল হতে-না-হতে ফটিক লোক দুটোর কথা প্রায় ভুলেই গেল।

॥ ৮ ॥

বিকেল চারটে নাগাদ হারুন উপেনবাবুর দোকানে এল। সে ক'দিন থেকেই বলে রেখেছে সে কোথায় থাকে সেটা ফটিককে দেখিয়ে দেবে। উপেনবাবুকে বলাতে উনি রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, বাকি ঘন্টা তিনেকের কাজ কেষ্টর ছেলে সতু চালিয়ে নিতে পারবে। সতু মাসে তিনবার করে জ্বরে পড়ে ; না হলে কাজ যে একেবারে জানে না তা নয়।
হারুন দোকান থেকে বেরিয়ে ফটিককে বলল, 'আজ এমন একটা আর্ট দেখাব তোকে যে তুই ব্যোমকে যাবি।' কথাটা শুনে ফটিকের মন এমন নেচে উঠল যে, উলটো দিকের ফুটপাথের পানের দোকানের সামনে সকালের সেই দুটো লোককে ও দেখতেই পেল না।
হারুনদা ঝুলে ঝুলে বাসে চড়ে না, কারণ তাতে তার হাতের ক্ষতি হতে পারে। 'হাত না চললে পেট চলবে না রে ফটকে, তাই পদব্রজই বেস্ট।'

অনেক অলিগলি ছোটবড় মাঝারি রাস্তা পেরিয়ে হারুন আর ফটিক শেষটা ব্রিজের উপর পৌঁছাল, যেটার তলা দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রেন যায়। ব্রিজ থেকে একটা সিঁড়ি নেমে গিয়ে একটা বস্তিতে পড়েছে। এই বস্তিতেই থাকে হারুনদা। ফটিক ব্রিজের উপর থেকেই দেখল, অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে বস্তিটা। দূরে এখানে-ওখানে কারখানার চিমনি দাঁড়িয়ে আছে নারকেল গাছের উপর মাথা তুলে। বস্তিটাকে দেখে ফটিকের মনে হল, সেটা যেন একটা ধোঁয়ার কম্বল মুড়ি দিয়ে রয়েছে। হারুনদা বলল, সেটা উনুনের ধোঁয়া ; সন্ধ্যের মুখে

ঘরে ঘরে উনুন জ্বলেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হারুন বলল, 'এখানে হিন্দু মুসলমান কেরেস্তান সবরকম লোক থাকে, জানিস। আর তাদের মধ্যে এমন এক-একটা আর্টিস্ট আছে না—দেখলে তাক লেগে যায়। জামাল বলে একটা কাঠের মিস্তিরি আমার ঘরে এসে গান শুনিয়ে যায় মাঝে মাঝে, আমি আমার চৌকিতে ঠেকা দিই। কোথায় আছি ভুলে যাই, এমনি তার আর্টের ভেল্‌কি।'

দু'দিকে খোলার ছাতওয়ালা বাড়ির মধ্যে দিয়ে সরু রাস্তা এঁকে বেঁকে চলে গেছে হারুনের বাড়ির দিকে। হারুন আর ফটিক পাশাপাশি হাঁটছে, আর এদিক-সেদিক থেকে আট-দশ-বারো-চোদ্দ বছরের ছেলেমেয়েরা হারুনকে দেখে লাফাচ্ছে, তালি দিচ্ছে, আর তার নাম ধরে ডেকে উঠছে। হারুন সব্বাইকে হাতছানি দিয়ে ডেকে সঙ্গে নিয়ে নিল ; বলল, 'আজ নতুন খেলা !'—'হো !—নতুন খেলা !'— বলে তারাও সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। হারুনদার যে এত বন্ধু আছে সেটা ফটিক জানতই না।

হারুনের ছোট্ট একটা ঘর, তাতে আলো বেশি আসে না, তাই বোধহয় হারুনদা এত রকম রঙচঙে জিনিস ঘরে সাজিয়ে টাঙিয়ে বিছিয়ে রেখেছে। কাপড়, কাগজ, পুতুল, ছবি, নকশা, ঘুড়ি সবকিছুই আছে। কিন্তু তাও দেখলে দোকান বলে মনে হয় না। যেখানে যেটা রাখলে মানায়, সেইটুকুই—তার বেশিও নয়, কমও নয়। ফটিক মনে মনে ভাবল, এটাও নিশ্চয়ই একটা দারুণ আর্ট। এছাড়া অবিশ্যি কাজের জিনিসও যতটুকু দরকার ততটুকু আছে। আর আছে হারুনের সেই বাক্স আর সেই থলি।

এত সব জিনিসের মধ্যে একটা জিনিস এতক্ষণ চাপা পড়ে ছিল, এবার বাতিটা জ্বালতেই সেটার দিকে চোখ গেল ফটিকের।

'ওটা কার ছবি হারুনদা ?'

বাতিটার ঠিক নিচেই বেশ বড় ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছোট্ট ছবি। গোঁফে চাড়া দেওয়া ঢেউ-খেলানো চুলওয়ালা একজন লোক সোজা ফটিকের দিকে চেয়ে আছে। তার তলায় খুব ধরে ধরে পরিষ্কার করে কালো কালিতে লেখা—এন্‌রিকো রাস্‌টেলি।

হারুন একটা বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'ও আমার আরেক গুরু। চোখে দেখিনি কখনো। ইতালিয়ান সাহেব। আমি যে খেলা দেখাই ও-ও সেই খেলা দেখাত। জাগ্‌লিং। প্রায় একশো বছর আগে। একটা ম্যাগাজিন থেকে ছবিটা কেটে রেখেছিলুম। আমাকে তো চারটে বল নিয়ে খেলতে দেখলি—ও খেলত একসঙ্গে দশটা বল নিয়ে। ভাবতে পারিস ? পাঁচটা নয়, সাতটা নয়—একেবারে দশটা ! লোকে দেখে একেবারে পাগলা হয়ে যেত।'

হারুনদা জাগ্‌লিং নিয়ে পড়াশুনা করেছে শুনে ফটিক অবাক হয়ে গেল। ও কি তাহলে ইংরিজি পড়তে পারে? 'ক্লাস এইট অবধি পড়েছিলুম ইস্কুলে', বলল হারুন। 'চন্দননগরে বাড়ি ছিল আমাদের। বাপের ছিল কাপড়ের দোকান। মাহেশের রথের মেলায় ভালো ভোজবাজি হচ্ছে শুনে চলে গেলুম দেখতে। দু'দিনের জন্য হাওয়া। ফাস্ কেলাস জাগ্‌লিং, জানিস। কিন্তু ফিরে আসতে বাপ দেখিয়ে দিলেন আরেকরকম জাগ্‌লিং। কাপড় কাটার ঢাউস কাঁচি হয় দেখেচিস? এই দ্যাখ তার রেজাল্ট।'

হারুন শার্ট তুলে পিঠে একটা গর্ত দেখিয়ে দিল।

'তিন হপ্তা লেগেছিল ঘা শুকুতে। তারপর একদিন মওকা বুঝে পকেটে এগারোটি টাকা আর কাঁধে পুঁটলি নিয়ে দুগ্‌গা বলে বেরিয়ে পড়লুম কাউক্কে কিচ্ছু না বলে। তিনবার ট্রেন বদল করে বিনি-টিকিটে ঝ্যাকড় ঝ্যাকড় করে তিন দিন তিন রাত্তির স্রেফ চা-বিস্কুট খেয়ে শেষটায় একদিন কামরার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি তাজমহল দেখা যাচ্ছে। নেমে পড়লুম। শহরে ঘুরতে ঘুরতে কেল্লায় গিয়ে হাজির হলুম। পেছনে মাঠ, তার পেছনে যমুনা, আর তারও পেছনে দূরে আবার দেখলুম তাজমহল। তারপরেই আমার চোখ গেল উলটো দিকে। কেল্লার গায়ে উপর দিকে বারান্দা, তার নিচে বাইরে ঘাসের উপর খেলা হচ্ছে। এক পাশে সাপ খেলছে, এক পাশে ভাল্লুক নাচছে, আর মধ্যিখানে, আসাদুল্লা দু-হাতে বল নাচাচ্ছে—তার চোখ রুমাল দিয়ে বাঁধা!...ভক্তি কি সাধে হয় রে ফটকে? গায়ের লোম খাড়া হয়ে চোখে জল এসে গেস্‌ল। মানুষের এত খ্যামতা হয়?'

'কারা দেখছিল সেই খেলা?' ফটিক জিজ্ঞেস করল।

'সাহেব, মেমসাহেব,' বলল হারুন। 'ওই উঁচুতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে, আর নিচের দিকে দশ টাকা পাঁচ টাকার করকরে নোট পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে—কেউ সাপের দিকে, কেউ ভাল্লুকের দিকে, কেউ বল খেলার দিকে। বেশির ভাগ বলের দিকেই ছুঁড়ছে। এক ব্যাটা সাহেবের মাথা মোটা, সে ব্যাটা না-পাকিয়েই ছুঁড়েছে একটা দশ টাকার নোট বলের দিকে, আর দমকা হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে সেটাকে ফেলেছে একেবারে ফণা-তোলা গোখরোর ঝাঁপির মধ্যে। ওস্তাদ তখন চোখের বাঁধন খুলে ফেলেছে। সাহেব উপর থেকে চেঁচাচ্ছে, আমি বুলেটের মতো ছুটে গিয়ে ঝাঁপির ভেতর ঘপাৎ করে হাত ঢুকিয়ে নোট বার করে এনে ওস্তাদের হাতে গুঁজে দিলাম। ওস্তাদ 'সাবাস বেটা—জিতে রহো' বলে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। আমি হিন্দি-ফিন্দি জানি না—পকেট থেকে দুটো কাঠের বল বার করে এই তিন দিনে শেখা লোফার খেলা দেখিয়ে দিলাম। ব্যস্—সেই দিন থেকে ওর দেহ রাখার দিনটা অবধি

আমি ওর ছায়ায়। তবু অ্যাদ্দিনেও লোকের সামনে সাহস করে চোখ বেঁধে খেলা দেখাতে পারিনি। আজ সেইটেই একবার চেষ্টা করে দেখব।'

বস্তির ছেলেমেয়ের দল হারুনের দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিল। হারুন থলি নিয়ে বেরোল, ফটিক তার পিছনে। বাঁ দিকে ঘুরল হারুন। আট-দশটা ঘর পেরিয়ে একটা খোলা জায়গা, তার পিছনে একটা ডোবা আর তারও পিছনে একটা কারখানার পাঁচিল। হারুন ডান দিকে খোলা জায়গাটার মধ্যে যেখানটা জংলাটা কম, সেখানে বসে পড়ল আসন বিছিয়ে। ছেলেমেয়েদের দল তার সামনে আর দু'পাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হারুন থলি থেকে বার করল একটা হলদের উপর কালো বুটি দেওয়া সিল্কের রুমাল। সেটা পাশেই দাঁড়ানো ফটিকের হাতে দিয়ে বলল, 'বাঁধ্ তো দেখি বেশ করে।'

ফটিক রুমালটা দিয়ে হারুনের চোখ বেঁধে পিছিয়ে ভিড়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

সেই চোখ-বাঁধা অবস্থায় হারুন তার গুরুকে তিনবার সেলাম জানিয়ে প্রথমে দুটো আর তারপর তিনটে পিতলের বল নিয়ে এমন আশ্চর্য খেলা দেখাল যে, ফটিকের মনে হল, তার মন থেকে যদি আবার সব মুছে গিয়ে শুধু আজকের খেলাটাই থেকে যায়, তাহলে তাই নিয়েই সে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে।

কিন্তু বলেই শেষ না। বল রেখে এবার বাঁধন না খুলেই হারুন থলি থেকে বার করল তিনটে ছুরি, যার আয়নার মতো ঝকঝকে ফলাগুলোতে বাড়ি-ঘর-গাছ-আকাশ সব-কিছু দেখা যাচ্ছে। ওই ফলাগুলো এবার নাচতে শুরু করল হারুনের হাতে। হারুনের সামনের আকাশ বাতাস চিরে ফালাফালা হয়ে গেল, কিন্তু একটিবারও ছুরিগুলো পরস্পরের গায়ে ঠেকল না, একটিবারও হারুনের হাতে একটি আঁচড়ও লাগল না।

বস্তির আকাশ যখন হাততালি আর চিৎকারে ফেটে পড়ছে, তখন ফটিক এগিয়ে গিয়ে হারুনের বাঁধন খুলতে গিয়ে পারল না, কারণ তার হাত কাঁপছে। হারুন বুঝতে পেরে হেসে নিজেই বাঁধন খুলে নিল। তারপর তার সরঞ্জাম থলিতে পুরে বাচ্চাদের দিকে ফিরে বলল, 'আজকের মতো খেল্ খতম। তোরা যে যার ঘরে ফিরে যা!'

ফটিকের কেন জানি মনে হচ্ছিল, এমন একটা খেলা দেখিয়ে হারুনের মুখে যতটা হাসি ফুর্তি থাকা উচিত ছিল, ততটা যেন নেই। হয়তো ওস্তাদের কথা মনে পড়ে তার মনটা ভারি হয়ে গেছে।

কিন্তু আসলে তা নয়। ঘরে ফিরে এসে হারুন কারণটা বলল ফটিককে।

'দুটো লোক—বুঝলি ফটিক—বেপাড়ার লোক—দেখিনি কখনো—দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিল তোর দিকে। বাঁধন খুলে উঠে দাঁড়াতেই চোখ গেছে আমার। লোক দুটোর ভাবগতিক ভালো লাগল না।'

কথাটা বলতেই ফটিকের ধক্ করে সেই দুটো লোকের কথা মনে পড়ে গেল। ও বলল, 'একজন ষণ্ডা আর একজন রোগা কি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। তুইও দেখলি?'

'এখন দেখিনি, দুপুরে।'

ফটিক বলল দুপুরের ব্যাপারটা। শুনে হারুনের মুখটা থমথমে হয়ে গেল। 'কানে লোমটা একটু বেশি কি?' হারুন জিজ্ঞেস করল। ফটিকের তক্ষুনি মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, সত্যিই তো! সবচেয়ে আগে কানের দিকেই চোখ গিয়েছিল ফটিকের—এখন হারুনদা বলাতে মনে পড়েছে।

'শ্যামলাল', চোয়াল শক্ত করে বলল হারুন। 'ওপর দিকটা ষণ্ডা হলে কী হবে, পা দু'খানা ধনুকের মতো বাঁকা। দূর থেকে পা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। দাড়ি ছিল, কামিয়ে ফেলেছে। কানের দাড়িটা আর কামানোর কথা খেয়াল করেনি। বছর কয়েক আগে চিৎপুরের একটা চায়ের দোকানে যেতুম মাঝে মাঝে। সেখানে দেখিছি। চার বন্ধু ছিল। একের নম্বরের—'

হারুন হঠাৎ থেমে গিয়ে ভুরু কুঁচকে আবার বলল, 'দু'জন লোক মরে পড়েছিল গাড়িতে—তাই না?'

ফটিক মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। হারুনের মুখ কালো হয়ে গেল। বলল, 'যা আঁচ করেছিলাম তাই রে ফটিক। তোর বাপের অনেক পয়সা।'

বাবা-টাবার কথা বললে ফটিকের মনে কোনো ভাবই জাগে না, তাই ও চুপ করে রইল। হারুন তক্তপোশ ছেড়ে উঠে গিয়ে পশ্চিমের জানালার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে দেখে বলল, 'এখনো আছে। সিগারেট ধরাল।'

বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। ফটিকের মনে পড়ল ওকে বাড়ি ফিরতে হবে। সেই বেনটিং স্ট্রীটে। হারুনদা ওকে পৌঁছে দেবে বলেছে, কিন্তু লোক দুটোর যদি মতলব খারাপ হয়ে থাকে তাহলে ওদের দু'জনেরই মুশকিল হতে পারে।

হারুনদা আবার তক্তপোশে বসে পড়েছে। ওকে এত গম্ভীর কখনো দেখেনি ফটিক। 'আমার বাড়ি ফেরার কথা ভাবছ?' ফটিক জিজ্ঞেস করল।

হারুন বলল, 'বাড়ি ফেরার অন্য রাস্তা আছে। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে লখা মিস্তিরির ঘরের ভেতর দিয়ে ওদিকের গলিটা ধরব। শ্যামলাল টের পাবে না। যদ্দূর মনে হয়, তল্লাটটা ও ভালো চেনে না। তোকে ধাওয়া করে এসে পড়েচে। না, ওটা চিন্তা না। চিন্তা তোর হচ্ছে ভবিষ্যৎ নিয়ে।' হারুন একটু

থামল। তারপর ফটিকের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, 'তোর এখনো কিচ্ছু মনে পড়েনি?'

ফটিক মাথা নাড়ল।—'কিচ্ছু না হারুনদা। মনে-পড়া কাকে বলে তাই জানি না।'

হারুন হাঁটুতে একটা চাঁটি মেরে উঠে পড়ল। তারপর ঘরের বাতিটা জ্বালিয়ে রেখে দরজায় একটা তালা এঁটে ফটিককে নিয়ে সামনের দরজার দিকে না গিয়ে উলটো দিকে ঘুরল।

॥ ৯ ॥

পরের রবিবারের সকাল।

ব্যারিস্টার শরদিন্দু সান্যালের বাড়িতে আজ মিটিং বসেছে বৈঠকখানায়। প্রায় ষাট বছরের পুরনো অভিজাত বাড়ির প্রকাণ্ড ড্রইংরুম। ঘরের পশ্চিম দিকের দেয়ালে যাঁর বাঁধানো ছবি রয়েছে, তাঁরই কীর্তি এই বাড়ি। ইনি শরদিন্দু সান্যালের পরলোকগত পিতৃদেব দ্বারকানাথ সান্যাল। ছেলে বাপেরই পেশা নিয়েছেন, তবে বাপের মতো এত অঢেল রোজগারের ভাগ্য তাঁর কখনো হয়নি। শোনা যায় দ্বারিক সান্যালের এক সময় আয় ছিল গড়ে দিনে হাজার টাকা।

আগের দিনের চেয়ে আজ যেন মিস্টার সান্যালের দাপটটা একটু কম। আসলে এতদিনেও গুণ্ডাদের কাছ থেকে কোনো হুমকি চিঠি না পেয়ে তিনি একটু ধাঁধায় পড়েছেন। সেই সঙ্গে ছেলের সম্বন্ধে দুশ্চিন্তাটাও আরো বেড়ে গেছে। আজ শুধু মিস্টার সান্যাল ও দারোগা সাহেব নন—ঘরে আরো দু'জন লোক রয়েছেন, মিস্টার সান্যালের দুই ছেলে, মেজো আর সেজো। বড়টিও এসেছিল, তবে দু'দিনের বেশি থাকতে পারেনি, দিল্লীতে তার একটা জরুরী মিটিং আছে।

মেজো ছেলে সুধীন্দ্রই এখন কথা বলছে। বছর ছাব্বিশেক বয়স, রং ফরসা, আজকের ফ্যাশানের ঝুলপিটা বড়, আর চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। সুধীন্দ্র বলছে, 'মেমরি লসের অনেক ইয়ে তো বিলিতি ম্যাগাজিনে পড়া যায় বাবা। এটা তো হতেই পারে। তুমি যে কেন বিশ্বাস করছ না সেটা আমি বুঝতেই পারছি না। অ্যামনিসিয়ার কথা পড়নি?'

সেজো ছেলে প্রীতীন কিছুই বলছে না। হারানো ভাইয়ের সঙ্গে নিজের বয়সের তফাতটা সবচেয়ে কম বলেই বোধহয় প্রীতীনের মনটা অন্যদের চেয়ে বেশি ভারি। ও বাবলুকে ক্রিকেট খেলা শিখিয়েছে, মোনোপলি শিখিয়েছে, দরকার হলে অঙ্ক বুঝিয়ে দিয়েছে, এই সেদিনও সার্কাস দেখাতে নিয়ে গেছে।

প্রীতীন খড়গ্‌পুর চলে যাবার পর থেকে অবিশ্যি দু-ভাইয়ের দেখা কমে গেছে। এখন যে প্রীতীন মাঝে মাঝে দু-হাতের তেলো দিয়ে কপালে আঘাত করছে তার কারণ ওর বিশ্বাস, ও কলকাতায় থাকলে বাবলুকে এইভাবে কিডন্যাপ করা সম্ভব হত না। ওর কেন যে এরকম ধারণা হল সেটা বলা মুশকিল, কারণ ও সেই সময় কলকাতায় থাকলেও ভাইয়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই থাকত না। বাবলু ফিরছিল ইস্কুল থেকে। বাড়ি কাছে হাওয়ায় বৃষ্টি না থাকলে ও হেঁটেই ফেরে। সঙ্গে থাকে ওর বন্ধু পরাগ—যার বাড়ি ওর তিনটে বাড়ি পরেই। সেদিন ইস্কুল ছুটি ছিল, কিন্তু ইস্কুলেরই খেলার মাঠে শিশুমেলা হবে কয়েকদিনের মধ্যেই, তাই কিছু ছেলেকে বাছাই করা হয়েছিল তার তোড়জোড়ে সাহায্য করার জন্য। বাবলু ছিল তাদের মধ্যে একজন। পরাগ ছিল না। তাই বাবলু সেদিন একাই বাড়ি ফিরছিল বিকেল সাড়ে-পাঁচটার সময়। সেই সময় তাকে ধরে নিয়ে যায় গুণ্ডার দল একটা নীল রঙের অ্যামবাসাডার গাড়িতে। ঘটনাটার একজন সাক্ষীও ছিল, পোদ্দারদের বাড়ির বুড়ো দারোয়ান মহাদেও পাঁড়ে।

'তাই যদি হয়,' মিস্টার সান্যাল একটু ভেবে বললেন, 'তাহলে তো সে ছেলে বাড়ি ফিরে এলে কাউকে চিনতেই পারবে না।'

'সেটারও ট্রিটমেন্ট হয়,' সুধীন্দ্র বলল। 'লস্ট মেমরি ফিরিয়ে আনা যায়। তুমি এ বিষয়ে ডক্টর বোসকে কনসাল্ট করে দেখতে পার। আর এখানে যদি সে-রকম স্পেশালিস্ট না থাকে, বিদেশে নিশ্চয়ই আছে।'

'তাহলে—' মিস্টার সান্যাল সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন। তিনি তাঁর কথা শেষ করার আগেই দারোগা মিস্টার চন্দ বললেন, 'আমি যেটা বলছি সেটাই করুন স্যার। অ্যাদ্দিনেও যখন তারা কোনো উচ্চবাচ্য করল না, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আপনার ছেলে অন্য কোথাও আছে। আর সে যদি সব-কিছু ভুলে গিয়েই থাকে, তাহলে তো সে আর নিজে থেকে বাড়ি ফিরবে না। তাই বলছি, আপনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিন। রিওয়ার্ড অফার করুন। তারপর দেখুন কী হয়। এতে তো আর কোনো ক্ষতি হচ্ছে না আপনার।'

'ওই লোক দুটোর কোনো হদিশ পেলেন?' মিস্টার সান্যাল জিজ্ঞেস করলেন।

'মনে হয় তারা কলকাতাতেই আছে,' বললেন দারোগাসাহেব, 'তবে খোঁজ যাকে বলে সেটা এখনো ঠিক...'

শরদিন্দু সান্যাল ড্রেসিং গাউনের পকেটে হাতটা চালিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাহলে তাই করা যাক্। বলু, তুই কালকের দিনটা থেকে বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থাটা করে দে। পিটু ছেলেমানুষ, পারবে না।'

সুধীন্দ্র মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। প্রীতীন্দ্র অপমানবোধে একটু নড়েচড়ে

বসল।

'ক'টা কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার কথা বলছেন আপনি?'

প্রশ্নটা দারোগাসাহেবকে করলেন মিস্টার সান্যাল। চন্দ বললেন, 'পাঁচটা তো বটেই—মিনিমাম। ইংরিজি বাংলা হিন্দি তিনটে ভাষাতেই দেওয়া উচিত। আমি হলে উর্দু আর গুরুমুখীটাও বাদ দিতাম না। কোন্ দলে গিয়ে পড়েছে আপনার ছেলে সে তো জানার উপায় নেই।'

'ওর একটা ছবিও দিতে হবে তো?'

এবার প্রীতীন্দ্র কথা বলল।

'আমার কাছে ছবি আছে বাবলুর। লাস্ট ইয়ার দার্জিলিং-এ তোলা।'

'দেওয়াই যখন হচ্ছে', বললেন মিস্টার সান্যাল, 'তখন ভালো করে চোখে পড়ার মতো বিজ্ঞাপন হয় যেন। খরচটা কোনো কথা না।'

॥ ১০ ॥

আজ সকাল থেকেই ফটিকের মনটা চনমনে। আজ হারুনদা প্রথম ময়দানে চোখ বেঁধে জাগ্‌লিং দেখাবে। সেদিন থেকে হারুন রোজই নিয়মমতো উপেনবাবুর দোকানে এসেছে। আগে একবার করে আসত, এ ক'দিন দু-বেলা এসেছে। সেদিন ওর বাড়ি থেকে ফিরতে ফটিকদের কোনো অসুবিধা হয়নি। শ্যামলাল আর সেই লোকটা ওদের পিছু নেয়নি।

হারুন যে কলকাতার অলিগলি কী-রকম ভালোভাবে জানে সেটা ফটিক সেদিন বুঝতে পেরেছে। লোকগুলো পিছু নিলেও হারুনের চরকিবাজির চোটে হিমসিম খেয়ে যেত।

হারুন প্রতিবার এসেই ফটিককে জিজ্ঞেস করেছে সেই দুটো লোক আর এসেছিল কিনা। কিন্তু তারা আর আসেনি। দোকানের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে কিনা সেটা ফটিক জানে না, কারণ রোজই তাকে সকাল থেকে রাত অবধি ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। বাইরে গিয়ে দু-দণ্ড দাঁড়াবারও সময় পায়নি। এ ক'দিনে তার কাজ আরো অনেকটা সড়গড় হয়ে এসেছে। গোড়ায় রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে বুঝতে পারত হাত দুটোতে একটা অবশ ভাব, কিন্তু গত ক'দিন সেটাও হয়নি। এমন-কি বিষ্যুদবার থেকেই ও কাজের পর খাওয়া-দাওয়া করে বিছানায় বসে দুটো কাঠের বল নিয়ে লোফালুফি অভ্যাস করেছে। বল দুটো হারুনদাই এনে দিয়েছে, একটা হলদে একটা লাল। কী করে লুফতে হয় সেটাও হারুনদা শিখিয়ে দিয়ে বলেছে, 'তুই যে আর্টটা শিখছিস সেটা পাঁচ হাজার বছর আগেও মিশরদেশে ছিল। পাঁচ হাজার কী বলছি—সৃষ্টির আদি থেকে ছিল। লক্ষ লক্ষ

কোটি কোটি বছর আগে।' ফটিক অবাক হয়ে গিয়েছিল। ভাবল হারুনদা বাড়াবাড়ি করছে। কিন্তু হারুন বুঝিয়ে দিল।

'এই যে পৃথিবী—এটাও তো একটা বল। আরো যত গ্রহ আছে—মঙ্গল বুধ বিষ্যুদ শুক্কুর শনি—সব এক-একটা বল। আর সব ব্যাটা ঘুরছে সূর্যকে ঘিরে। আবার চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে। অথচ কেউ কারুর গায়ে গায়ে লাগছে না। ভাবতে পারিস ? এর চেয়ে বড় জাগ্‌লিং হয় ? রাত্তিরে আকাশের দিকে চাইলেই বুঝবি কী বলছি।...বল দুটো যখন হাতে নিবি, তখন এই কথাটা মনে রাখিস।'

কিন্তু লোক দুটো না এলেও ফটিক বুঝতে পারছে যে হারুনদার মনে একটা ভয় ঢুকে গেছে যেটা সহজে যাবার নয়। এক এক সময় মনে হয় শুধু ভয় না, আরো কিছু ; কিন্তু সেটা যে কী সেটা ফটিক বুঝতে পারে না। ও খালি লক্ষ করে যে হারুনদার চোখের জ্বলজ্বলে ভাবটা মাঝে মাঝে চলে গিয়ে চোখ দুটো কিছুক্ষণের জন্য কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে।

এসব কথা অবিশ্যি ময়দানে গিয়ে আর ফটিকের মনে হয়নি। হারুন গত রবিবারে যেখানে খেলা দেখিয়েছিল, সেখানে আজ আগে থেকেই ছেলের দল ভিড় করে রয়েছে। ফটিক তাদের কয়েকজনকে দেখেই চিনল। ওই যে সেই মুখে বসন্তের দাগওয়ালা কানা ছেলেটা ; ওই যে সেই বেঁটে বামুনটা যাকে দূর থেকে দেখলে বাচ্চা মনে হয়, আর কাছে এসেই গোঁফদাড়ি দেখে চমকে যেতে হয় ; আর ওই যে সেই লুঙ্গিপরা ঢ্যাঙা ছেলেটা যার দাঁত সবসময় বেরিয়ে থাকে। হারুনকে দেখেই ছেলের দল হাততালি দিয়ে হৈ-হৈ করে উঠল।

হারুন তার জায়গায় বসে একবার আকাশের দিকে চেয়ে নিল। ফটিক জানে কেন। পশ্চিমের আকাশে মেঘ জমেছে। বৃষ্টি এলে খেলা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। হে ভগবান—যেন বৃষ্টি না হয়, যেন হারুনদা আজ চোখ বেঁধে খেলা দেখিয়ে এদের চোখ টেরিয়ে দিতে পারে, যেন সে আজ আঠারো টাকা বত্রিশ পয়সার চেয়ে অনেক বেশি রোজগার করতে পারে। ইস্, কয়েকটা সাহেব-মেম ভিড়ের মধ্যে থাকলে বেশ হত ! এখানে কে ফেলবে দশ টাকা, পাঁচ টাকার নোট !

দূর থেকে আসা একটা মেঘের ডাকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে হারুন তার খেলা শুরু করে দিল। আজ থুতনির উপর লাট্টুর খেলাটা শেষ করে হারুন ভিড়ের মধ্যে থেকে ইশারা করে ফটিককে কাছে ডাকল। লাট্টুটা তখনো হারুনের তেলোতে ঘুরছে। ফটিক আসতেই হারুন তাকে হাত পাততে বলে নিজের হাত থেকে লাট্টুটা ফটিকের হাতে চালান দিয়ে বলল, 'ধর এটা।'

তেলোতে সুড়সুড়ি লাগার সঙ্গে সঙ্গে ফটিকের সমস্ত শরীরে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে আজ হারুনদার অ্যাসিস্ট্যান্ট, হারুনদার শিষ্য !

হারুন এবার আরেকটা ঘুরন্ত লাট্টু ডান হাতে নিয়ে অন্যটা ফটিকের হাত থেকে নিজের বাঁ হাতে নিয়ে নিল। তারপর যতক্ষণ দুটো লাট্টুতে দম থাকে, ততক্ষণ চলল চোখ-ধাঁধানো ঘুরন্ত লাট্টুর জাগ্‌লিং।

তারপর এমনি বলের খেলা শেষ হলে ফটিকের আবার ডাক পড়ল। হারুনদা থলি থেকে বুটিদার সিল্কের রুমালটা বার করে ফটিকের হাতে দিল। ফটিক রুমাল দিয়ে হারুনের চোখ ঢাকতেই ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা হৈ-হৈ রব উঠল। অন্ধকার হয়ে এসেছে ঠিকই, কিন্তু ফটিক জানে তাতে কিছু এসে যাবে না ; হারুনদার চোখেও এখন অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই। এ খেল্ দেখাতে হারুনদার আলোর দরকার হয় না।

দু' বলের খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ফটিক বুঝেছে যে, আজকে আগের দিনের চেয়ে অনেক বেশি পয়সা পড়বে। অনেক নতুন লোক এসে জমা হয়েছে এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

হারুন থলে হাতড়ে তিন নম্বর পিতলের বল বার করল। বেশ জোরে একটা মেঘের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে চোখ-বাঁধা হারুন ওস্তাদের উদ্দেশে সেলাম জানিয়ে বল আকাশে ছুঁড়ল। বল চার পাক ঘোরার পর পাঁচ পাকের বেলা ফটিকের চোখের সামনে যেটা ঘটল, তার চেয়ে যদি আকাশ ভেঙে ওর মাথায় পড়ত তাতে ওর কষ্ট অনেক কম হত।

ঠিক হারুনদার মাথার উপরে একটা বল আরেকটা বলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে একটা সাতচড়া কান-ফাটানো শব্দ করে ছিটকে গিয়ে পড়ল দু'দিকে ঘাসের উপর।

আরো অবাক এই যে, যে লোকগুলো এতক্ষণ হারুনকে তারিফ করছিল, তালি দিচ্ছিল, সাবাস দিচ্ছিল, তারা হঠাৎ রাক্ষস হয়ে গিয়ে বিকট সুরে হেসে উঠে সেই একই হারুনকে দুয়ো দিতে লাগল।

তাও বেশিক্ষণের জন্য নয়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভিড় উধাও হয়ে গিয়ে জায়গাটা খালি হয়ে গেল। এদিকে হারুন নিজেই চোখের বাঁধন খুলে থলির মধ্যে তার খেলার সরঞ্জাম তুলে ফেলেছে। ফটিক পয়সাগুলো তুলতে যাচ্ছিল, হারুন তার দিকে একটা ধমক ছুঁড়ে সেটা বন্ধ করে দিল। তারপর ঘাসের উপর বসেই একটা বিড়ি ধরাল। ফটিক তার পাশে গিয়ে বসল। নিজে থেকে কিছু বলার সাহস নেই তার ; সে ইচ্ছেও নেই। চৌরঙ্গী থেকে গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে, যা এর আগের দিন, বা একটুক্ষণ আগে পর্যন্ত ফটিকের কানেই যায়নি। দুটো টান দিয়ে বিড়িটাকে ঘাসের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হারুন বলল, 'মনের সঙ্গে হাতের এমন যোগ না রে ফটিক—একটা গুম্‌সে গেলে অন্যটাও খেলতে চায় না।...যদ্দিন না তোর একটা হিল্লে হচ্ছে তদ্দিন ব্লাইন্ড জাগ্‌লিং এস্টপ্।'

কী বলছে এসব আবোলতাবোল হারুনদা ? বেশ তো আছে ফটিক। আবার কী হিল্লের দরকার ? হারুন বলে চলল, 'সেদিন শ্যামলালকে দেখার পর থেকেই তোর ঘটনাটা একটা ছকে এসে গেছে। লোকগুলো তোকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। তোকে কোনো একটা গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখে তোর বাবার কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে তবে তোকে ছাড়ত। ওদের প্ল্যান ভণ্ডুল হয়ে যায় গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে। শ্যামলাল আর আরেক ব্যাটা বেঁচে যায়, অন্য দুটো মরে। তোকে বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকতে দেখে শ্যামলালের হয়তো ধারণা হয়েছিল তুইও মরে গেছিস, তাই তোকে ফেলেই পালায়। তারপর সেদিন উপেনদার দোকানে গিয়ে দ্যাখে ফস্‌কে-যাওয়া শিকার আবার হাতের কাছে এসে গেছে।

'সেদিন তোকে পৌঁছে বাড়ি ফিরে এসে দেখি দু' ব্যাটা তখনো ঘুরঘুর করছে। এগারোটা পর্যন্ত ছিল, তারপর চলে যায়। আমি পেছনে ধাওয়া করি, করে ওদের ডেরাটা জেনে নিই। পুলিশে বললে ওরা ধরা পড়ে যায় ; কিন্তু ওদের ধরিয়ে দিলেই তো আর খেলা ফুরিয়ে যাচ্ছে না।...আমার উচিত তোকেও পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া।'

'না না, হারুনদা।'

'জানি। তোর মন আমি জানি। তাই তো কিছু করতে পারছি না। আর সত্যি বলতে কী, তোর পরিচয়টা জানা হয়ে গেলে অন্য কথা ছিল। এখন তোকে পুলিশে দেওয়া আর একটা রাস্তার কুকুরকে পুলিশে দেওয়া একই ব্যাপার।'

কথাটা শুনে ফটিকের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ও বলল, 'রাস্তার কুকুর কাঠের বল নিয়ে জাগ্‌লিং করতে পারে ?'

'তুই অভ্যেস করচিস ?' হারুন জিজ্ঞেস করল, এই প্রথম ফটিকের দিকে সোজা তাকিয়ে, এই প্রথম একটু হেসে।

'করছি না ?'—ফটিকের অভিমান এখনো যায়নি।—'সারাদিন কাজের পর রাত্তিরে ঘুমোনোর আগে এক ঘন্টা রোজ।' ফটিক পকেট থেকে বল দুটো বার করে হারুনকে দেখিয়ে দিল।

'গুড', বলল হারুন। 'দেখি, আর দুটো দিন দেখি। কেউ যদি তোর খোঁজখবর না করে তো তোকে সঙ্গে নিয়েই যাব।'

'কোথায় ?'—ফটিক অবাক। হারুনদা যে আবার কোথাও যাবার কথা ভাবছে সেটা ও এই প্রথম শুনল।

'এখনো ঠিক করিনি। কাল সেই ভেঙ্কটেশের একটা চিঠি পেয়েছি। আসতে লিখেচে। এইভাবে মাটি থেকে পয়সা কুড়িয়ে নিতে আর ভালো

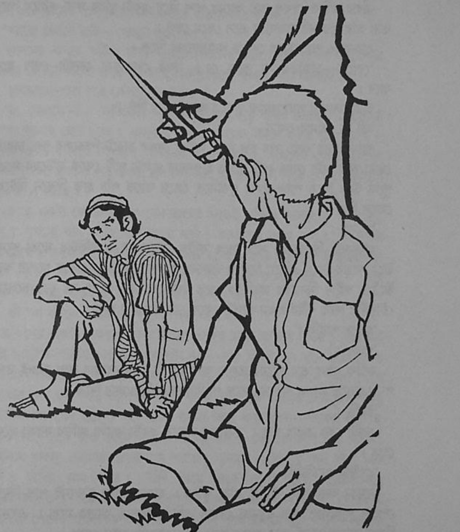

লাগছে না রে। অনেক দিন তো—'

'তোমার এই খুদে সাকরেদটি কে হে ?'

কথাটা এমন আচমকা এল যে ফটিকের মনে হল তার কলজেটা এক লাফে গলার কাছে চলে এসেছে।

সেই দুটো লোক অন্ধকারে পিছন থেকে এসে দাঁড়িয়েছে। ফটিকের ডান

কাঁধের পাশে এখন শ্যামলালের ধনুকের মতো বাঁকা প্যান্ট-পরা বাঁ পা।

এবার ফটিক দেখল তার কানের পাশ দিয়ে একটা ছুরির ফলা এগিয়ে গিয়ে তার আর হারুনের মাঝখানে এসে থেমে গেল।

হারুনদাও আড়চোখে দেখছে শ্যামলালের দিকে।

'রোঘো—চাকতিগুলো তুলে নে। নন্দর দোকানের দেনাটা শোধ হয়ে যাবে।'

অন্য লোকটা পয়সাগুলো তুলতে আরম্ভ করে দিল।

'কী হে, আমার কথার—'

শ্যামলালের কথা শেষ হল না। ফটিক দেখল চারটে পিতলের বল, চারটে ছোরা আর দুটো বোমা লাট্টু সমেত হারুণদার থলিটা মাটি থেকে হাউয়ের মতো শূন্যে উঠে গিয়ে শ্যামলালের থুতনিতে লেগে তাকে পাঁচ হাত পিছনে ছিটকে ফেলে দিল।

'ফট্‌কে।'

হারুনদার চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ফটিক দেখল সে-ও থলিটার মতো শূন্যে উঠে ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে হারুনের বগলদাবা হয়ে। এদিকে ধুলোর ঝড় উঠেছে শহীদ মিনারের চারদিকে, আর ময়দানের যত লোক সব ছুটে চলেছে চৌরঙ্গীর দিকে বৃষ্টির প্রথম ঝাপটা থেকে রেহাই পাবার জন্য।

'ছুটতে পারবি ?'

'পারব।'

ফটিক বুঝল তার পায়ের তলায় আবার মাটি, আর বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই তার পা-ও চলতে লাগল হারুনের সঙ্গে পা মিলিয়ে গাড়িগুলোর দিকে।

'ট্যাক্সি !'

একটা ব্রেক কষার শব্দ। ফটিকের সামনে একটা কালো গাড়ির দরজা খুলে গেল।

'সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ !'

সামনে অন্য গাড়ি, ট্যাক্সি, বাস, স্কুটার। হারুন ফটিক দু'জনেই পাশ ফিরে দেখছে শ্যামলাল আর রঘুনাথ দৌড়ে এগিয়ে আসছে ঝড়ের মধ্যে। এখনো দিনের আলো আছে, তবে রাস্তায় আর দোকানে বাতি জ্বলে গেছে।

ট্যাক্সি সামনে ফাঁক পেয়ে রওনা দিল। হারুন ড্রাইভারকে বলল, 'বাড়তি পয়সা দোব ভাই—একটু তেজ লাগান।'

বাঁয়ে ঘুরে চৌরঙ্গী ধরে ট্যাক্সি এগিয়ে চলল ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। সামনে চৌমাথা। ধরমতলার মোড়। বাতি লাল ছিল ; ফটিকদের ট্যাক্সি পৌঁছতে সবুজ হয়ে গেল। গাড়ি মোড় পেরিয়ে বিজলি-আপিস বাঁয়ে ফেলে

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর চওড়া রাস্তা ধরল। রবিবার, তাই ভিড় কম। ফটিক বুঝল তার কানের পাশ দিয়ে শনশন করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

'আরো জোরে ভাই—পেছনে গণ্ডগোল।'

হারুনের কথায় ফটিক মাথা ঘুরিয়ে পিছনের কাঁচ দিয়ে দেখল আরেকটা ট্যাক্সির জোড়া আলো ক্রমে বড় হয়ে তাদের দিকে ধাওয়া করে আসছে।

'হারুনদা—ওরা ধরে ফেলবে আমাদের !'

'না, ফেলবে না।' ফটিকের কান বাতাসে বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। জোড়া আলো আবার ছোট হচ্ছে। এবার ঝাপসা হয়ে গেল, কারণ কাঁচে বৃষ্টি পড়ছে। ফটিক সামনের দিকে ফিরল। সামনের কাঁচেও বৃষ্টি। সামনেও জোড়া জোড়া গোল আলো একটার পর একটা হুশ্ হুশ্ করে ট্যাক্সির পাশ দিয়ে বেরিয়ে উলটো দিকে চলে যাচ্ছে।

এবার একটা জোড়া আলো যেন তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। গাড়ি নয়, বাস। ধুমসো বাস। দৈত্যের মতো বাস। রাক্ষসের মতো বাস। ওই দুটো ওর চোখ। ক্রমে বড় হচ্ছে, বড় হচ্ছে, বড় হচ্ছে। হতে হতে বাসটা হঠাৎ লরি হয়ে গেল। দু'পাশের বাড়িগুলো আর নেই...আলোগুলো আর নেই। তার বদলে অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার, জঙ্গল, জঙ্গল, জঙ্গল...

'কী হল ফট্‌কে ? এলিয়ে পড়লি কেন ? কী হল ?'

হারুনের প্রশ্নটা একরাশ ফিরে আসা শব্দের মধ্যে হারিয়ে গেল। প্রথমেই সেই গাড়িতে গাড়িতে লাগার কানফাটা শব্দ—যার পরেই ওর মনে হয়েছিল ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় উড়ছে। সেটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা কানে তালা লেগে যাওয়ার ভাব হল, আর তারপরেই তার বারো বছর তিন মাসের জীবনে যা-কিছু ঘটেছিল সব যেন হুড়মুড় করে এসে তাকে ঘিরে ধরে বলল—আমরা এসেছি, যখন চাও, যাকে চাও বেছে নাও। তারাই বলল, তোমার ভাল নাম নিখিল, ডাকনাম বাবলু, তোমার বাবার নাম শরদিন্দু সান্যাল ; তোমার তিন দাদা, এক দিদি ; দিদির নাম ছায়া। দিদি বিয়ে করে চলে গেছে বরের সঙ্গে সুইটজারল্যান্ড। তারাই বলল তোমার ঠামা তোমাদের বাড়ির দোতলায় বারান্দার শেষের বাঁ দিকের ঘরটাতে—রাতদিন পুজোর ঘরে খুটুং খাটুং—নাকের উপর চশমা এঁটে ইয়া মোটা কাশীরামের ছেঁড়া পাতার উপর ঝুঁকে পড়ে সুর করে দুলে দুলে পড়া ঠামা...ছোড়দা বলল, 'এই দ্যাখ, ড্রাইভ মারার সময় রিস্ট কী ঘোরে,' আর অঙ্কের স্যার মিস্টার শুক্লা বলছে, 'স্টপ ইট মনমোহন !'—মনমোহনের গোল মুখ গোল মাথায় এত সরু বুদ্ধি—যতবার বিক্রমটা পেনসিল কেটে ডেস্কের উপর রাখছে, ও পিছন থেকে কাগজের নল পাকিয়ে ফুঁ দিয়ে সেটাকে গড়িয়ে মাটিতে ফেলে দিচ্ছে। সবচেয়ে হাসি পায়

মনে করলে, দিদির বিয়েতে গ্রামোফোনে বিসমিল্লার সানাই, আর পুরনো রেকর্ড ফাটা জায়গায় এসে প্যাঁও প্যাঁও প্যাঁও প্যাঁও প্যাঁও প্যাঁও একই জিনিস বারবার আর তাই শুনে সামিয়ানার তলায় যত লোক সব খাওয়াটাওয়া ফেলে হো হো হো হো— । আর হ্যাঁ, দার্জিলিং তো মনে পড়েই, আর তার আগের বছর পুরী, তার আগে মুসুরি, তার আগে আবার দার্জিলিং, আর তারও অনেক অনেক আগে ছোটবেলায় ওয়ালটেয়ারে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে পায়ের তলায় বালি সরে সরে যাচ্ছে আর সুড়সুড়ি লাগছে আর মনে হচ্ছে ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে সরসর সরসর করে সরে যাচ্ছে, আর মা যেই বললেন, পড়ে যাবে বাবলু সোনা, অমনি ধপাস্ ঝপাং !—মা'র কথা অবিশ্যি বেশি মনে নেই । এখন খালি একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি । এখন বাড়িতে লোক আর নেই । এত বড় বাড়ি আর তিনজন মাত্র লোক । ছোটকাকার তো মাথাই খারাপ । আগে ছিল বাড়িতেই, যখন মাথা ঠিক ছিল । এখন লুম্বিনীতে । ...

ও আবার শুনতে পেল ট্যাক্সির শব্দ । বাইরের রাস্তার আলো দেখতে পেল । হারুনদা—হ্যাঁ, ওই তো হারুনদা—ওর পাশের জানালার কাঁচটা তুলে দিল ।

'ভয় পেলি নাকি—অ্যাই ফটকে,' হারুনদা বলছে । 'আর ভয় নেই । ওরা আর নেই পেছনে ।'

ও শুনতে পেল, পাশের বাড়ির রাইট সাহেবদের অ্যালসেশিয়ানটা ভারি গলায় ঘেউ-ঘেউ করছে । কুকুরের নাম ডিউক । ও ডিউককে ভয় পায় না । ওর ভীষণ সাহস । ও রাত্রে একা শোয় । একবার দার্জিলিং-এ ও বার্চ হিলের রাস্তা দিয়ে অনেক দূর গিয়ে হঠাৎ কুয়াশা এসে সব ঢেকে দিল । ও তখন একা । ওর মনে আছে ও ভয় পায়নি ।

'শরীর খারাপ লাগছে ? না মন খারাপ ?' হারুনদা জিজ্ঞেস করছে ।

ও মাথা নাড়ল ।

'তবে কী ?'

ও হারুনদার দিকে চাইল । বাইরে বৃষ্টি পড়ছে । ট্যাক্সি চলছে এখনো । কাঁচ তোলা, তাই আস্তে বললেও কথা শোনা যায় । ও আস্তেই বলল ।

'সব মনে পড়ে গেছে হারুনদা ।'

॥ ১১ ॥

ওরা দু'জন এখন চিৎপুরের একটা দোকানে বসে রুটি-মাংস খাচ্ছে । ও জানে এ-রকম জায়গায় এসে ও কোনোদিন খায়নি, হারুনদার সঙ্গে না এলে হয়তো

কোনোদিন আসত না । হারুনদা এতক্ষণ ওকে জিজ্ঞেস করে করে সব জেনে নিয়েছে । ইস্কুল থেকে ফেরার সময় লোকগুলো কী করে ওকে রাস্তা থেকে ছিনিয়ে তুলে নিল, তাও বলেছে ।

'লাউডন স্ট্রীটে তোর বাড়িতে পথ চিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবি ?' হারুন জিজ্ঞেস করল । 'ও তল্লাট আমার চেনা নেই ।'

ও হেসে উঠল । —'আরেব্বাস, খুব সহজ ।'

'হুঁ...'

হারুন একটু ভাবল । তারপর বলল, 'আজ রাত করে যাবার দরকার নেই । আর তোর চেহারাটাকেও একটু ফিরিয়ে নিতে হবে । চুলটা আর একটু বড় হলে ভালো হতো, কিন্তু উপায় নেই । কাল পরিষ্কার প্যান্ট-শার্ট পরে রেডি থাকবি । আমি সক্কাল সক্কাল এসে পড়ব । উপেনদাকে এখন কিছু বলার দরকার নেই । আমি পরে ম্যানেজ করব ।'

ও এখনো কিছুই ভালো করে ভাবতে পারছে না । বাড়ি তো যেতেই হবে । বাবা আছে, ঠামা আছে, হরিনাথ বুড়ো চাকর আছে । হরিনাথ ওর সব কাজ করে দেয় । ও চায় না, তা-ও করে দেয় । ওর রাগ হয়, কিন্তু হরিনাথ বুড়ো বলে কিছু বলে না । তারপর ইস্কুল আছে, রাম খেলাওন দারোয়ান, মিস্টার শুকুল হেডমাস্টার, পি-টি মাস্টার মিঃ দত্ত, ওর ক্লাসের বন্ধুরা—অঞ্জন, প্রীতম, রুসি, প্রদ্যোত, মনমোহন । একবার সেই চাঁদপাল ঘাট থেকে স্টীমার করে বোটানিক্‌স-এ পিকনিক...

ওর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল, আর তক্ষুনি সেটা হারুনদাকে না বলে পারল না ।

'আমাদের বাড়ির একতলায় একটা ঘর আছে, কেউ থাকে না হারুনদা ! খালি একটা পুরনো আলমারি আর একটু পুরনো ভাঙা টেবিল রয়েছে । ওগুলো সরিয়ে দিলেই তুমি থাকতে পারবে ।'

হারুন একবার আড়চোখে ওর দিকে দেখে নিল । তারপর রুটির আধখানা ছিঁড়ে নিয়ে মুখে পুরে বলল, 'আমার বস্তির ঘরের মতো করে সাজিয়ে নিতে দেবে তোর বাবা ?'

বাবার চেহারাটা মনে করে ও যে খুব ভরসা পেল তা নয় ; কিন্তু তাহলে কি হয় ? মানুষ তো বদলাতে পারে । তাই ও বলল, 'কেন দেবে না ? নিশ্চয়ই দেবে ।'

'ভেরি গুড', বলল হারুন, 'তাহলে বলব তোর বাবা খাঁটি আর্টিস্ট । খলিফ হারুনের খেয়ালগুলো আর্টিস্ট ছাড়া কেউ বুঝবে না ।'

॥ ১২ ॥

খবরের কাগজের সব-কিছুই যে সবাই পড়ে বা দেখে তা নয়। বিশেষ করে সাঁতরাগাছির কাছে একটা বিশ্রী রেল-দুর্ঘটনার খবর কাগজের সামনের পাতার অনেকখানি জুড়ে থাকায় অনেকেরই আর পিছনের পাতায় বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়েনি। যাদের পড়েছে তারা সকলেই স্বীকার করল যে ব্যারিস্টার শরদিন্দু সান্যাল তাঁরা হারানো ছেলেকে ফিরে পাবার আশায় যে পুরস্কারটা ঘোষণা করেছেন, সেটা তাঁর মতো ধনী লোকের পক্ষে বেশ মানানসই হয়েছে। পাঁচ হাজার টাকা মুখের কথা নয়।

উপেনবাবু বিজ্ঞাপনটা দেখেননি। হারুন নিয়মিত কাগজ না পড়লেও একবার অন্তত উলটে-পালটে দেখে সকালে সিংহিমশাইয়ের চায়ের কেবিনে বসে। আজ সেটা হয়ে ওঠেনি, কারণ তার সে মেজাজ ছিল না। ভোর সাড়ে-পাঁচটায় উঠে কোনোমতে এক কাপ চা খেয়ে সে সাতটার মধ্যে পৌঁছে গেছে ফটিকের কাছে। এখন বোধহয় আর ফটিক বলাটা ঠিক নয় ; কিন্তু হারুনের কাছে ওই নামটাই ওর নাম। নিখিল নয়, বাবলু নয়, এমন কি সান্যালও নয়। ওর নাম ফটিকচন্দ্র পাল।

উপেনবাবু অবিশ্যি একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন হারুন ফটিককে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। তাতে হারুন বলল, 'একটু সাহেবপাড়ায় যাচ্ছি উপেনদা ; ফিরে এসে সব বলব।' উপেনবাবু জানেন, হারুনের মাথায় মাঝে মাঝে ছিট দেখা দেয়। তবে লোকটা ভালো, তাই ওকে আর কিছু না বলে কেষ্টর ছেলে সতুর দিকে ফিরে বললেন, 'আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙতে হবে না। কাজ আছে, হাতমুখ ধুয়ে রেডি হয়ে নে।'

॥ ১৩ ॥

শরদিন্দু সান্যাল তাঁর ক্লার্ক রজনীবাবুকে বললেন, 'আজকাল কাগজ আর ছাপা যা হয়েছে—এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ।...বাবলুর এমন সুন্দর ছবিটাকে এইভাবে ছেপেছে ?'

'আপনি এইটে দেখেছেন স্যার ?'—বলে রজনীবাবু একটা ইংরিজি কাগজ মিস্টার সান্যালের দিকে এগিয়ে দিলেন। 'ওতে কিন্তু বাবলু বলে চিনতে অসুবিধে হয় না।'

শরদিন্দু সান্যালের সামনে ডাঁই করা খবরের কাগজে। রজনীবাবুকে বলাই ছিল উনি যেন আসার সময় কিনে আনেন। এমনিতে রজনীবাবু সাড়ে-আটটায়

আসেন। আজ তাড়াতাড়ি আসার কারণ, সান্যাল সাহেবের বিশ্বাস, কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেই যত সব আজেবাজে লোক টাকার লোভে যেখান-সেখান থেকে ছেলে ধরে এনে তাঁর সামনে হাজির করবে। তখন ব্যাপারটা যাতে বেসামাল না হয়ে পড়ে, তার জন্য সেজো ছেলে প্রীতীন আর বেয়ারা কিশোরীলাল ছাড়াও তিনি রজনীবাবু ও জুনিয়র ব্যারিস্টার তপন সরকারকে সকাল সকাল আসতে বলেছেন। সরকার এখনো আসেননি, আর প্রীতীনের এখনো ঘুম ভাঙেনি। সে রাত জেগে পরীক্ষার পড়া করেছে। আজই দুপুরে সে খড়্গপুর ফিরে যাবে।

বাইরে একটা ট্যাক্সি থামার আওয়াজ পেয়ে মিস্টার সান্যাল হাত থেকে কফির পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এই শুরু হল।' শুরুতেই যে শেষ সেটা শরদিন্দু সান্যাল ভাবতে পারেননি।

'বাবা !'

একী, এ যে বাবলুর গলা !

শরদিন্দু সান্যালের দৃষ্টি পর্দাওয়ালা বাইরের দরজাটার দিকে চলে গেল। তার ঠিক পরেই পর্দা ফাঁক করে বাবলু এসে ঢুকল ঘরে।

'কী ব্যাপার ? কোথায় ছিলি অ্যাদ্দিন ? কে আনল তোকে ? একী, তোর চুলের এ কী দশা ?'

প্রশ্নগুলো এক নিশ্বাসে করে গেলেন শরদিন্দু সান্যাল ; এবং করেই একটা পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তাঁর চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন—যেন উত্তরগুলো জানাটা বড় কথা নয়, ছেলে ফিরে এসেছে সেটাই বড়।

তারপরেই তাঁর চোখ গেল বাবলুর পাশে পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে বারান্দায় দাঁড়ানো লোকটার দিকে। 'আপনি ভেতরে আসুন,' বললেন মিস্টার সান্যাল। যেই হোক না কেন, ভিতরে ডাকতেই হবে ; একটা পুরস্কারের ব্যাপার আছে তো।

লোকটা দরজার দিকে এগিয়ে এল। মিস্টার সান্যাল রজনীবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'দারোয়ানকে বলে দিন বাচ্চা ছেলে সঙ্গে করে কেউ এলে যেন ঢুকতে না দেয়। বলুন যেন বলে দেয় যে ছেলে ফিরে এসেছে।'

রজনীবাবু হুকুম তামিল করতে চলে গেলেন। পর্দা ফাঁক হতেই মিস্টার সান্যাল দেখলেন যে, লোকটা দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

একে ভদ্রলোক বলা যায় কি ? মিস্টার সান্যাল ভেবে স্থির করলেন—না, যায় না। শার্টটা সস্তা এবং ময়লা, পায়ের চটিটা ক্ষয়ে গেছে, সাদা সুতির প্যান্টটায় অজস্র ভাঁজ। আর ও-রকম চুল আর ঝুলপি—না, ওগুলোকে অভদ্র বলা মুশকিল, কারণ তার নিজের সেজো ছেলে প্রীতীন্দ্রর চুল আর ঝুলপিও তো কতকটা ওইরকমই।

'ভেতরে এস।'

হারুন চৌকাঠ পেরিয়ে এল।

'কী নাম তোমার?'

'ও হারুনদা, বাবা। আর্টিস্ট। দারুণ খেলা দেখায়।'

শরদিন্দু সান্যাল তাঁর সদ্য-ফিরে-পাওয়া ছেলের দিকে একটু বিরক্তভাবেই চেয়ে বললেন, 'তুমি থামো বাবলু। ওকে বলতে দাও। তুমি বরং ওপরে যাও। ঠামাকে গিয়ে বলো, তুমি ফিরে এসেছ—বড় কষ্ট পেয়েছেন এ ক'টা দিন। আর ছোড়দাও আছে। ঘুমোচ্ছে। ওকে তুলে দাও গিয়ে।'

বাবলুর কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যাবার ইচ্ছে নেই। হারুনদাকে ফেলে সে যাবে কী করে? ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে বাবার চোখের আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাবলু। ও হারুনদাকে দেখতে পাচ্ছে। ওর পিছন দিকটা।

শরদিন্দু সান্যাল আবার লোকটার দিকে চাইলেন।

'শুনি তোমার ব্যাপার।'

'ও খড়গ্‌পুর থেকে আমার সঙ্গে এসেছে। চলন্ত ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করছিল। আমি টেনে তুলি। তারপর থেকে এখানেই ছিল।'

'এখানে মানে?'

'কলকাতায় বেনটিং ইস্ট্রীটে। একটা চায়ের দোকানে।'

'চায়ের দোকানে?' মিস্টার সান্যালের চোখ কপালে উঠে গেছে। 'কী করছিল চায়ের দাকানে?'

'কাজ করছিল স্যার?'

'কাজ? কী কাজ?' মিস্টার সান্যাল যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করছেন না।

হারুন বলল। মিস্টার সান্যালের মাথায় চুল প্রায় নেই বললেই চলে, থাকলে বোধহয় বেশ কয়েক গাছা ছিঁড়ে ফেলতেন।

'হোয়াট ইজ অল্ দিস!' চেয়ার ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার সান্যাল—'এ কি মগের মুল্লুক নাকি? ওকে দিয়ে চায়ের দোকানের বয়ের কাজ করিয়েছ? তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই? দেখে বুঝলে না, ও ভদ্রলোকের ছেলে?'

বাবলু আর থাকতে পারল না। ও বারান্দা থেকে দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকে বলল, 'আমার খুব ভালো লাগছিল কাজ করতে বাবা!'

'চুপ করো!'—গর্জন করে উঠলেন মিস্টার সান্যাল। 'তোমাকে বললাম না ওপরে যেতে?'

বাবলু আবার দরজার বাইরে চলে গেল। অ্যাদ্দিন পরে বাড়িতে ফিরে এসে যে এ-রকম একটা ব্যাপার হবে, সেটা ও ভাবতেই পারেনি।

হারুন এখনো শান্তভাবেই দাঁড়িয়ে আছে, আর শান্তভাবেই সে বলল, 'আমি যদি জানতুম ও কোন্ বাড়ির তাহলে কি আর আমার কাছে রাখতুম স্যার। ও যে বলতে পারলে না। ওর কিছু মনে ছিল না।'

'আর আজ কাগজে বেরোনোমাত্র সব মনে পড় গেল?'

মিস্টার সান্যাল যে হারুনের কথা মোটেই বিশ্বাস করছেন না, সেটা তাঁর প্রশ্নের সুর থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল। হারুন কথাটা শুনে একটু অবাক হল।

'কাগজের কথা কী বলছেন জানি না স্যার। ওর মনে পড়েছে কাল রাত্তিরে। কাল বাদলা ছিল তাই আর আনিনি। আজ নিয়ে এলুম, আপনার হাতে তুলে দিলুম—ব্যস্‌, আমার ডিউটি ফিনিশ। তবে, ইয়ে, ওর মাথার একটা জায়গায় দেখবেন একটু ফোলা আছে। মাঝে মাঝে ব্যথা হয়। যদি ডাক্তার-ফাক্তার দেখান, তাই জানিয়ে দিলুম। ...চলি রে ফট্‌কে।'

হারুনদা চলে গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাবলু ব্যাপারটা ভালো করে বোঝবার আগেই ওকে বাবা ডাকলেন। 'বাবলু, একবার এদিকে এস।'

ও এল। টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। শরদিন্দু সান্যাল ছেলের মাথার দিকে হাত বাড়ালেন। 'কোথায় ফোলা রে?'

বাবলু দেখাল। সত্যিই ফোলাটা এখনো পুরোপুরি যায়নি। পাছে ব্যথা লাগে, তাই মিস্টার সান্যাল আর সেখানে হাত দিলেন না।

'খুব কষ্ট হয়েছে এ-ক'দিন?'

ও মাথা নাড়ল। না, হয়নি!

'ওপরে যাও। হরিনাথকে বলো, গরম জলে বেশ করে চান করিয়ে দেবে। আজ তোমার ছুটি। আজ ডাক্তারবাবু এসে তোমাকে দেখবেন। যদি বলেন যে ঠিক আছে, তাহলে কাল থেকে তুমি আবার ইস্কুলে যাবে। এবার থেকে রোজ গাড়িতে। ...যাও।'

ও চলে গেল।

মিস্টার সান্যাল সামনে টেবিলের উপর থেকে খবরের কাগজের স্তূপটা হাতের একটা বিরক্ত ঝাঁটে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'চায়ের দোকান!—ফুঃ!'—তারপর রজনীবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'চায়ের দোকান! ভাবতে পার?'

রজনীবাবু কেবল একটা কথাই ভাবছিলেন—যদিও সেটা তাঁর মনিবকে বলা যায় না, কারণ কথাটা তাঁর সম্পর্কেই। তিনি ভাবছিলেন যে, যে-লোকটা বাবলুকে ফেরত দিয়ে গেল, তার খবরের কাগজ না-দেখার সুযোগটা নিয়ে মিস্টার সান্যাল তাকে পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করে কাজটা বোধহয় ভালো করলেন না।

ঘন্টাখানেক পরে মিস্টার সান্যাল দারোগা মিস্টার চন্দর কাছ থেকে একটা ফোন পেলেন।

'আপনার বিজ্ঞাপনের কোনো ফল পেলেন?' জিজ্ঞেস করলেন দারোগাসাহেব।

উত্তরে মিস্টার সান্যাল যা বললেন তাতে তিনি খুশি তো হলেনই, সঙ্গে সঙ্গে অবাকও হলেন রীতিমতো। বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার স্যার!—এক একটা সময়

আসে যখন মনে হয়, এগোবার বুঝি আর রাস্তা নেই। আবার তারপরেই হঠাৎ দেখবেন, ম্যাজিকের মতো সব রাস্তা খুলে গেছে। আপনার ছেলেও ফিরল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সেই গ্যাঙের দুটি লোকও অ্যারেস্ট হয়ে গেল।'

'সে কী!' বললেন মিস্টার সান্যাল। 'কী করে হল?'

'একটা লোক ফোন করে তাদের ডেরার হদিস দিয়ে দেয়। আধ ঘন্টাও হয়নি, ওদের ঘুম থেকে তুলে ধরে আনা হয়েছে। থানায় এসে ঘুম ছুটে গেছে। পুরো ব্যাপারটা স্বীকার করেছে।'

এই টেলিফোনের দশ মিনিটের মধ্যে বাবলু-চুরির পুরো ব্যাপারটা শরদিন্দু সান্যালের মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেল।

বাবলুর ঠাকুরমা তাঁর নাতিকে ফিরে পেয়ে কিছুক্ষণ তাকে জড়িয়ে ধরে 'ধন আমার মানিক আমার' বলে পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ওর ব্যথার জায়গাগুলোতে নতুন করে ব্যথা লাগিয়ে দিয়ে আবার চলে চললেন তাঁর পুজোর ঘরে। গোপালই তাঁর নাতিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। গোপালের উপর তাঁর ভক্তি তিনগুণ বেড়ে গেছে। বাবলু নতুন করে বুঝেছে যে ঠাম্মার পুজোর ঘন্টা ওর নিজের ঘর থেকে শোনা গেলেও, আসলে ঠাম্মা থাকেন অনেক দূরে।

ছোড়দা আড়াইটের সময় খড়গপুর চলে গেল। সে বলল, 'ভাবতে পারিস, তুই রয়েছিস খড়গপুরে, নিজের নাম বাপের নাম সব ভুলে রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছিস, আর আমিও রয়েছি সেই একই শহরে মাইলখানেকের মধ্যে, অথচ কিছুই জানতে পারলাম না। স্কাউন্ড্রেল দুটোকে হাতের কাছে পেলে স্রেফ একটি করে কারাটে চপ—ব্যস্‌, ওদেরও বাপের নাম ভুলিয়ে দেওয়া যেত। ...যাক্‌, তোকে হোম টাস্ক দিচ্ছি—যা ঘটল তা বেশ গুছিয়ে লিখে ফ্যাল্‌ তো ইংরিজিতে। তুই তো "এসে"-টেসে বেশ ভালো লিখতিস। লিখে ফ্যাল্‌। নেক্সট টাইম এসে দেখব।'

এ বাড়িতে বাবলুর নতুন করে দেখার কিছুই নেই। সবই ওর জানা, ওর দেখা। প্রতিটি ঘর, প্রতিটি বারান্দা, প্রতিটি সিঁড়ির ধাপ। ওর নিজের ঘরে দেয়ালের উপর দিকে একটা জায়গায় ড্যাম্প লেগে নকশা ফুটে উঠেছিল যেটা দেখতে ঠিক যেন আফ্রিকার ম্যাপ। বাবলুর সেটা সম্বন্ধে একটা কৌতূহল ছিল। এবার ফিরে এসে ঘরে গিয়েই দাগটার দিকে চেয়ে দেখল সেটা বেড়ে ছড়িয়ে অনেকটা উত্তর আমেরিকার মতো হয়ে গেছে।

সাড়ে-তিনটের সময় গোলগাল নাদুস-নুদুস ডক্টর বোস এলেন। বাবলু দেখেছে, তার যখন একশো চার জ্বর হয়েছে তখনো ডাক্তারবাবুর মুখে হাসি। ছোড়দা একবার বলেছিল, ওঁর মুখের মাস্‌লগুলোই নাকি ওইরকম, তাই হাসতে না চাইলেও মুখ হাসি-হাসি দেখায়। হরিনাথ ডাক্তারবাবুর ব্যাগ বয়ে নিয়ে

এল। সঙ্গে রজনীকাকুও ছিলেন, আর চৌকাঠের বাইরে পর্দা ফাঁক করে পুরু চশমার ভিতর দিয়ে দেখছিল ঠামা। বাবা তখনো কোর্ট থেকে ফেরেননি। ডাক্তারবাবু ঘরে ঢুকেই বললেন, 'তোমার দাম কত জান তো বাবলুবাবু ? পাঁচটা তুমি হলেই একটা অ্যামবাসাডর হয়ে যায়—হ্যাঁ-হ্যাঁ !'

বাবলু তখন কথাটার মানে বুঝতে পারেনি। বুঝল, যখন ডাক্তারবাবু পরীক্ষা-টরীক্ষা শেষ করে তার পিঠে একটা চাপড় মেরে রজনীকাকুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাগ্যবান পুরুষটি কে মশাই ? পাঁচ হাজার ইজ নো জোক !' —আর রজনীকাকু গলা খাঁকরিয়ে 'ওটা, ইয়ে—লোকটির নামটা...মানে...' বলে থেমে গেলেন। ডাক্তার বোস আর ব্যাপারটা না ঘাঁটিয়ে 'ওয়েল বাবলুবাবু—একদিন এসে তোমার গপ্‌পো শোনা যাবে কেমন ?'—বলে চলে গেলেন, আর হরিনাথ আর রজনীকাকুও ওঁর পিছন পিছন বেরিয়ে গেল।

বাবলু বুঝতে পারল, বাবা হারুনদাকে ফাঁকি দিয়েছেন। ও আজকাল মাঝে মাঝে খবরের কাগজ দেখে—খেলার খবর দেখে, কোথায় কী সিনেমা হচ্ছে দেখে। ও জানে কাগজে মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশের খবর বেরোয়। তাতে যে হারিয়েছে তার ছবি থাকে, আর পুরস্কারের কথা থাকে। বাবাও কি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন নাকি ?

বাবলু নিচে গেল। বাবার আপিস ঘরে থাকে খবরের কাগজ। গিয়ে দেখল, দশটা খবরের কাগজে পাঁচরকম ভাষায় ওর সেই সিনচল লেকের ধারে ছোড়দার তোলা ছবিটা দিয়ে বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে। হারানো ছেলে নিখিল (ডাকনাম বাবলু) সান্যালের সন্ধান দিতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার।

হারুনদা কাগজ পড়েনি, তাই হারুনদা টাকা চায়নি। এই টাকা হারুনদার পাওনা। না চাইলেও পাওয়া উচিত ছিল। বাবার দেওয়া উচিত ছিল। বাবা দেননি।

বাবলুর মনটা এত ভারি হয়ে গেল যে, সে কিছুক্ষণের জন্য বাগানে গিয়ে পেয়ারা গাছটার তলায় চুপ করে বসে রইল। বাবা হারুনদাকে ফাঁকি দিয়েছেন। টাকাটা পেলে হারুনদা নতুন খেলার জন্য নতুন জিনিস কিনতে পারত, ছোট ঘর ছেড়ে আরেকটু বড় ঘরে গিয়ে থাকতে পারত। হয়তো অনেকদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারত। দিব্যি খেয়ে-পরে হেসে-খেলে গান গেয়ে কাটাতে পারত।

হয়তো ও এতক্ষণে কাগজ পড়ে বিজ্ঞাপনটা দেখে ফেলেছে, আর দেখে না জানি কী ভাবছে !

বাবলু বাগান থেকে বেরিয়ে এল। ওই যে বৈঠকখানা। প্রকাণ্ড বৈঠকখানা। চারিদিকে ছড়ানো সোফা, টেবিল, বইয়ের আলমারি, মূর্তি, ছবি,

ফুলদানি। কোনোটাতেই এমন রং নেই যাতে মনটা খুশি হয়। সোফার ঢাকনাগুলো ময়লা হয়ে গেছে, নক্‌শাগুলো প্রায় বোঝাই যায় না। কেউ বদলায়নি, তাই এই দশা। দিদি থাকলে খেয়াল করে বদলে দিত। এখন কেউ করে না।

বাবলু বেশ কিছুক্ষণ একা একটা সোফায় পা তুলে বসে রইল। দেয়ালের ঘড়িটায় ঢং ঢং করে চারটে বাজল। পাশের বাড়ি থেকে ডিউক কুকুরটা একবার ঘেউ করে উঠল। বোধহয় বারান্দা থেকে কোনো রাস্তার কুকুরকে দেখেছে। হারুনদা সেদিন ওকে বলেছিল রাস্তার কুকুর। বাবলুর মনে হল সেটা হলে তাও ভালো ছিল।

॥ ১৪ ॥

সাড়ে-চারটের সময় হরিনাথ চায়ের জন্য বাবলুর খোঁজ করে বুঝতে পারল, খোকাবাবু বাড়ি নেই। তাতে হরিনাথের খুব বেশি ভাবনা হল না, কারণ তিনটে বাড়ি পরেই বাবলুর বন্ধু থাকে। অ্যাদ্দিন পরে বাড়ি থেকে খোকাবাবু নিশ্চয়ই তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছে ; একটু পরেই ফিরে আসবে।

বাবলু তার বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু হরিনাথ যার কথা ভাবছে সে-বন্ধু নয়। দারোয়ানের চোখ এড়িয়ে বাগানের পিছনের পাঁচিল টপকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাবলু লাউডন স্ট্রীট, পার্ক স্ট্রীট দিয়ে, লোয়ার সার্কুলার রোড পেরিয়ে শেষটায় সি আই টি রোডে পৌঁছে একে ওকে জিজ্ঞেস করে ঠিক হাজির হয়েছিল সেই ব্রিজটাতে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে ডান দিক বাঁ দিক হিসেব রেখে টিউব কলের ধারে মেয়েদের ভিড় পেরিয়ে একটু যেতেই, কয়েকটি ছেলে তাকে দেখে বলল, 'হারুনদা নেই, হারুনদা চলে গেছে।'

বাবলু চোখে অন্ধকার দেখল।

'কোথায় চলে গেছে ?' সে হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল।

এবার একজন লুঙ্গিপরা বুড়ো একটা ঝুরঝুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'হারুনকে খুঁজচ খোকা ? সে আজ মাদ্রাজ যাবে বলে ট্রেন ধরতে গেছে। সার্কাস কোম্পানি তাকে ডেকে পাঠিয়েছে।'

হাওড়া যাবার জন্য দশ নম্বর বাস ধরতে হবে সেটা বস্তির কয়েকজন ছেলেই বাবলুকে বলে, ওকে ট্রেন লাইন পেরিয়ে একেবারে বাসস্টপে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। উপেনবাবুর দেওয়া আগাম টাকাটা বাবলু সবসময়ই তাঁর প্যান্টের পকেটে রাখত। তার থেকেই বাসভাড়া আর হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম টিকিট হয়ে গেল।

হারুনদার গাড়ি ছেড়ে দেয়নি তো ?

'মাদ্রাজের গাড়ি কোন প্ল্যাটফর্মে—মাদ্রাজের গাড়ি ?'

'সাত নম্বর, খোকা, ওই যে ওই দিকে। ওই দ্যাখ নম্বর।'

লম্বা ট্রেনটা দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছে লম্বা পাড়ি দেবে বলে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বাবলু এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে চলল। থার্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস,...ফার্স্ট ক্লাস...লোকজন মাল কুলি বাক্স-প্যাটরা হোল্ডল পুঁটলি সব ডিঙিয়ে পাশ কাটিয়ে কনুই দিয়ে ঠেলে সরিয়ে একটা জায়গায় এসে বাবলু থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

একটা চায়ের দোকানের পাশে লোকে ভিড় করেছে, তাদের মাথার উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে তিনটে চায়ের কাপ শূন্যে লাফ মারছে, আর লোকগুলো হো-হো করে উঠছে, হাততালি দিচ্ছে।

গাড়ি ছাড়তে কিছু দেরি, তাই হারুনদা খেলা দেখাচ্ছে।

বাবলু ভিড় ঠেলে হারুনদার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'এ কী, তুই এখানে ?'

হাততালির জন্য হারুনদাকে বেশ চেঁচিয়ে বলতে হল কথাটা। তারপর কাপ তিনটে দোকানদারের হাতে তুলে দিয়ে হারুন আবার বাবলুর দিকে ফিরল।

'আমার ওখানে গেসলি বুঝি ? ওরা বলে দিল "আমি নেই" ?'

ও কিছু বলছে না দেখে হারুনই বলে চলল, 'সেদিন তোকে মাদ্রাজের সেই ভেঙ্কটেশের চিঠিটার কথা বলছিলাম না ?—ভেবে দেখলাম, মওকাটা ছাড়া উচিত হবে না। ওখানে চোখ বেঁধে এক চাকার সাইকেল চালাতে চালাতে জাগলিং দেখাতে হবে। কম-সে-কম মাসখানেক প্র্যাকটিস লাগবে। তাই একটু আগে যাওয়া ভালো।'

ও টাকাটার কথা বলতে গিয়েও পারল না। হারুনদা একটা নতুন সুযোগ পেয়েছে—হয়তো অনেক বেশি রোজগার করবে। আর ওকে দেখেও মনে হচ্ছে ও ফূর্তিতে আছে। যদি টাকাটার কথা বললে ওর মন খারাপ হয়ে যায় !

ওর নিজের মন খারাপের কথাটাও বলতে হল না, কারণ হারুনদা বুঝে ফেলেছে।

'বাড়িতে ভাল্লাগছে না তো ?'

'না হারুনদা।'

'ফটকেটা জ্বালাচ্ছে, তাই তো ? বলছে, উপেনদার দোকানে ইস্কুল করতে হত না, কতরকম লোক দেখা যেত—হারুনদা কতরকম খেলা দেখাত, কলকাতার রাস্তার দিয়ে কেমন হেঁটে বেড়াতাম দু'জনে—তাই তো ?'

সব ঠিক বলেছে হারুনদা। ও মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। হারুন বলল,

'ফট্‌কেটাকে একটু ধমক না দিলে ও তোকে লেখাপড়া করতে দেবে না। সেটা কোনো কাজের কথা নয়। কত আপসোস হয় আমার জানিস—আরো পড়িনি বলে ?'

'তাও তো তুমি এত ভালো খেলা দেখাও। তুমি তো আর্টিস্ট।'

'আর্টিস্ট কি শুধু একরকম হয় ? তোদের বাড়ির মতো বাড়িতে থেকে কি আর্টিস্ট হওয়া যায় না ? লেখাপড়া করে আর্টিস্ট হয় না ? শুধু বলের খেলাতেই কি আর্টিস্ট ? বলের খেলা, রঙের খেলা, কথার খেলা, সুরের খেলা—কতরকম খেলা আর কতরকম আর্টিস্ট হয় জানিস ? যখন বড় হবি তখন জানতে পারবি, কোন্ খেলাটা কী স্টাইলে খেলতে হবে তোকে। তখন তুই—'

ও আর পারল না। গার্ড হুইসল দিয়ে দিয়েছে। ওকে বলতেই হবে কথাটা। ও হারুনদার কথার উপরেই চিৎকার করে বলল, 'বাবা তোমায় টাকা দেয়নি হারুনদা। পাঁচ হাজার টাকা ! তুমি না নিয়েই চলে যাবে ?'

হারুন ওর কামরার পা-দানিতে উঠে সামনের দিকে ঝুঁকে হেসে বলল, 'তোর ছবিটা ও-রকম হয়েছে কেন ? মনে হচ্ছে খোক্কসের ছা।'

হারুনদা জানে ! ও কাগজ দেখেছে !

ট্রেনের ভোঁ বেজে উঠল। ও হারুনদার কামরার দরজার দিকে এগিয়ে গেল। হারুন বলল, 'তোর বাবাকে বলিস, হারুনদা বলেছে ওঁর ছেলেকে ফেরত দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা নিতে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু ভাইকে বিক্রি করে কেউ টাকা নেয় ?'

গাড়ি ছেড়ে দিল। ও কিছু ভাবতে পারছে না। ও শুনছে হারুনদা চেঁচিয়ে বলছে, 'গ্রেট ডায়মন্ড সার্কাস—এলে দেখতে যাস—এক চাকার সাইকেলে চোখ বেঁধে বলের খেলা !'

'এখানে আসবে হারুনদা ?'

ও ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে। বেশিক্ষণ পারবে না।

'আসতেই হবে ! সার্কাসের কদর কলকাতায় সবচেয়ে বেশি। দেশের সব শহরের মধ্যে !'

হারুনদা হাত নাড়ছে।

হারুনদা দূরে চলে যাচ্ছে।

হারুনদা মিলিয়ে গেল।

ট্রেন চলে গেল।

ওই যে সবুজ গোল আলো। ওটাকে বলে সিগন্যাল। বাবলু এখন জানে। ওর মানে লাইন ক্লিয়ার।

হাতের আস্তিন দিয়ে চোখ মুছে বাবলু বাড়ির দিকে পা বাড়াল। দুটো কাঠের

বল ওর পকেটে। আর, একটা মানুষ—যাকে ও খুব ভালো করে চেনে—যাকে দিয়ে ওর অনেক কাজ হবে—তাকে ও মনের এক কোনায় পুরে রেখে দেবে।

তার নাম শ্রীফটিকচন্দ্র পাল।